বঙ্গভঙ্গ: তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনীতি

মাহবুব উল্লাহ্

বঙ্গভঙ্গ : তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনীতি

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ : তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনীতি

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

প্রকাশনায়
বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি

প্রকাশকাল
মে ২০০৭
বৈশাখ ১৪১৪

কভার ডিজাইন
নজরুল ইসলাম বাদল

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স লি.
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯১১৪৪১৩৫৯

মূল্য : ৫০ টাকা

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্রত্যেক জাতি নিরন্তর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে লিপ্ত থাকে। ইতিহাস ও সমাজ বিকাশের ধারায় নব নব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জাতি আবিষ্কার করে তার আপন সত্তা। জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর রয়েছে সু-বিস্তীর্ণ পটভূমি। এই পটভূমিতে ১৯০৫'র বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বঙ্গভঙ্গকে রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বৃটিশ শাসকরা বলতে চেয়েছে, প্রশাসনিক প্রয়োজনে বঙ্গভঙ্গ অপরিহার্য ছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বঙ্গভঙ্গকে দেখেছেন বৃটিশ শাসকদের 'ভাগ কর' এবং 'শাসন কর' কৌশলেরই একটি অংশ হিসেবে। তাদের মতে, বঙ্গভঙ্গ সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথ প্রশস্ত করেছে। অন্য দিকে শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর বাংলার মুসলমান সমাজ যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষক, তাদের জন্য বঙ্গভঙ্গ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। আধুনিক বাংলাদেশে যে বিশাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে তার জন্য বঙ্গভঙ্গের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের হিন্দু এলিট শ্রেণীর নিকট সুখকর ছিলো না। তারা এর মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার কৃষক-প্রজা সমাজের উপর তাদের আধিপত্য হারানোর বিপদ দেখতে পেয়েছিল। সুচতুর ও উচ্চ শিক্ষিত এই গোষ্ঠীটি তাদের স্বার্থ-বুদ্ধিকে আড়াল করতে চেয়েছে বাংলা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মত পাপাচারের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু তাদের সেই কুটিল চেহারা আড়াল থাকেনি ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগের পক্ষে জেদ ধরায়।

২০০৫-এ বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ পূর্তি হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশে শতবর্ষ পূর্তির এই সময়টি প্রায় নিরবেই পার হয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ পালনে সেই সময় ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী সরকারের অনীহা আমাদের অনেককেই দুঃখ দিয়েছে। নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস বিস্মৃত রাখার এই রাজনৈতিক কৌশল শেষ বিচারে যে কাজে আসে না তা উপলব্ধি করার সময় এখন।

এই পুস্তিকায় 'বঙ্গভঙ্গ : তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনীতি'র প্রসঙ্গসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে 'বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'– আয়োজিত সেমিনারে গত ৩১ মার্চ ২০০৬ উপস্থাপন করা হয়। ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। বঙ্গভঙ্গ : তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনীতির উপর অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণা আমাদের নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ করছে। ফিরে দেখার ইতিহাসের বিচারে সময় এসেছে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গকে বিচার-বিশ্লেষণ করার। আমি আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস বাংলাদেশের নব-প্রজন্মকে আমাদের জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিমূল অনুসন্ধানে উৎসাহিত করবে।

এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি অনুলিখনে তরুণ কবি ও সাংবাদিক তৌফিক জহুর আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। তাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। পুস্তিকাটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি-কে।

চার্মভিল
১৬৯, গ্রীনরোড,
ঢাকা-১২০৫

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রাক-কথন ০৫

প্রশাসনিক চৌহদ্দির বিস্তৃতি ও বঙ্গভঙ্গ ০৫

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ০৮

বঙ্গভঙ্গ-পূর্ব মুসলিম সমাজ ১০

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বণ্টন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ১১

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ১২

হিন্দু ভদ্রলোকদের সাম্প্রদায়িকতা ১৬

বঙ্গভঙ্গ-মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ৩০

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও তৎপরবর্তী রাজনীতি ৩৬

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ ৪৬

যুক্ত বাংলার পরিকল্পনা ৫১

শেষের কথা ৫৪

তথ্যসূত্র ৫৬

www.pathagar.com

প্রাক-কথন

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মাইলফলক। এই ঘটনাকে ইতিহাসবিদরা ভিন্নমুখী অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ইতিহাসবিদদের চোখে বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্তটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির বাস্তব প্রয়োগ। বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা চেয়েছিল হিন্দু-মুসলমানে ভেদবুদ্ধি উস্কে দিয়ে তাদের শাসনকে প্রলম্বিত করতে। অপরদিকে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে তাদের যৌক্তিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার একটি সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের মুখপাত্ররা বলার চেষ্টা করেছেন, বঙ্গভঙ্গের পেছনে কোন দুরভিসন্ধি কাজ করেনি। প্রশাসনিক সমস্যার ভারে জর্জরিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। অস্বীকার করা যাবে না বঙ্গভঙ্গের এই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ ভারতে এতদঞ্চলে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। সেই উত্তাপের আঁচ আজো বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুভব করা যায়। বঙ্গভঙ্গের বিষয়টিকে একটি যৌক্তিক কাঠামোতে উপস্থাপন করা না হলে আমাদের জাতীয় পরিচয় ও জাতীয় অস্তিত্ব বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে যাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ দেশের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এদের মধ্যে যাদের যৎসামান্য ধারণা আছে, তারাও 'অখণ্ড ভারতপন্থী'দের বিভ্রান্তিকর বিশ্লেষণের প্রভাবে বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি বহাল থাকার অর্থ বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি– বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে বিভ্রান্তি।

প্রশাসনিক চৌহদ্দির বিস্তৃতি ও বঙ্গভঙ্গ

পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর শুরু হয় কোম্পানির রাজ্য সম্প্রসারণের পালা। কোম্পানির রাজত্ব ১৮২৬ সাল নাগাদ পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে দিল্লিকেও ছাড়িয়ে যায়। ১৮৩৬-এ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হয়। ১৮৬২ সালে আরাকানকে ব্রিটিশ বার্মার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৪ সালে চিফ কমিশনারের অধীনে আসামে পৃথক প্রশাসন চালু করা হয়। এসব সত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রশাসনের আওতাধীন ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও এর পার্বত্য এলাকাসমূহ এবং কিছু করদ রাজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই প্রদেশের আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি পঁচাশি লক্ষ। আয়তনের দিক থেকে বিশাল এবং জনসংখ্যার দিক থেকেও বিশাল এই অঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৮৪৩ সালে প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর এগারো বছর পর গভর্নর জেনারেলকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যক্ষ প্রশাসন পরিচালনার শ্রমসাধ্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পৃথক পদ সৃষ্টি করা হয়। লেফটেন্যান্ট গভর্নর একাই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তাকে সাহায্য করার জন্য কোনো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ছিলো না। লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে গভর্নর জেনারেলের কাছে জবাবদিহিতা করতে হতো।

www.pathagar.com

১৮৫৪ সালের পর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন প্রায় চার ভাগের এক ভাগ হ্রাস পেলেও জনসংখ্যা চার-পাঁচ কোটি থেকে আট কোটিতে বৃদ্ধি পায়। এই জনসংখ্যা তখন উপমহাদেশের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। এর ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রমের চাপও বেড়ে যায়।

ভারত সরকার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের জন্য একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, এতে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিতে হতো। প্রস্তাব করা হলো, জাতিগত ও ভাষাগত কারণে প্রদেশটিকে ভাগ করা হোক। এই প্রস্তাব বাংলা ভাষাভাষী সিভিল সার্ভেন্টদের পছন্দনীয় ছিল না। কারণ, এর ফলে তাদের পদোন্নতির পথ সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বাংলা ভাগের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে একটি বহুল আলোচিত ব্যাখ্যা হলো এর মাধ্যমে হিন্দুদের ঐক্য বিনষ্ট করে হিন্দু-মুসলমানে দূরত্ব বাড়িয়ে এবং সংবাদপত্রের সাহসী ভূমিকাকে দুর্বল করে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশকে রুদ্ধ করা। ডব্লিউ বি ওল্ডহ্যাম নামে একজন ব্রিটিশ ১৮৯৬ সালে এ রকম একটি যুক্তি হাজির করেছিলেন। প্রশাসনিক সমস্যার জন্যই হোক কিংবা অন্য কোন মতলব থেকেই হোক, ব্রিটিশ সরকারের জন্য সব দিক থেকে গ্রহণযোগ্য সমাধান ছিল বঙ্গদেশকে ভাগ করা। জুলাই ৪, ১৯০৫ এ লক্ষ্যে কোলকাতা থেকে সরকারি ঘোষণা দেয়া হল।

বিষয়টিকে লর্ড কার্জনের ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব পালনের সমস্যা হিসেবেও দেখা হয়। তাঁর দায়িত্বকালের শেষ দিকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিম্ন প্রদেশগুলো (Lower Provinces) কার্যত প্রশাসনশূন্যতায় ভুগছে। বাংলার পূর্বাঞ্চলের অর্ধেক এলাকা জুড়ে এই সমস্যা ছিল অত্যন্ত প্রকট। এ অঞ্চলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য দালানকোঠা ছিল অপ্রতুল, বলতে গেলে না থাকার মতো। থানা পুলিশের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। বেশ কিছু জেলার আয়তন এত বড় ছিল যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টরের পক্ষে প্রশাসন চালানো ছিল দুরূহ। বাংলাদেশে তখন পাট চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। পাট রায়তের জন্য কিছু আর্থিক সচ্ছলতা এনে দিয়েছিল। সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলে সম্পদ ও সমৃদ্ধিকেন্দ্রিক বিরোধও বৃদ্ধি পায়। রায়তরা বেশি করে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ছিল। ফলে আদালত ও জেলা প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ছিল। স্কুল-কলেজের সংখ্যাও কিছু কিছু করে বাড়ছিল। ফলে বাড়ছিল শিক্ষিত বেকার। বেকারত্বের অসন্তোষের সঙ্গে যোগ হচ্ছিল রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সংবাদপত্রের বৈরী শিরোনাম। ১৯০২ সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জন লিখেছিলেন 'Bengal is ungovernably too large a charge for any single man.' লর্ড কার্জনের এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের প্রধান প্রবক্তা। ঘটনাটি কিন্তু তা নয়। আগেই বলা হয়েছে ১৮৭৪ সালে আসামকে বঙ্গদেশ থেকে পৃথক করে চিফ কমিশনারের ওপর এর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল বাংলা ভাষাভাষী তিনটি জেলা– সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া। এ নিয়ে তখন কেউ

www.pathagar.com

আপত্তি করেনি। পুরো চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথাও ভাবা হয়েছে অনেকবার। এই ভাবনার পেছনে কাজ করেছিল আসামের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা। তবে এই ভাবনা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। লর্ড কার্জন যখন বঙ্গদেশ শাসনের সমস্যার কথা লিখছিলেন, তার পরবর্তী দশ বছরে বঙ্গদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র দু'বার বদল হয়েছে। বাংলা সরকারের জন্য একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নিয়োগ করা হলো। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পরিবর্তে গভর্নর নিয়োগ করা হলো। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হলো।

বঙ্গদেশের প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের সামনে দুটি বিকল্প ছিল। প্রদেশটিকে ভাগ করা অথবা সরকারের সম্প্রসারণ করা। প্রশাসন সম্প্রসারণের বিকল্প অগ্রাহ্য করা হলো। অতীতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন না করার পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল, ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তির ইচ্ছা অনুরাগের ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনা বিদ্যমান প্রশাসনিক সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কার্যকর। ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলা সরকারের সম্পর্ক এমন ছিল যে তাতে বাংলা সরকারকে পৃথক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি ছিল অচিন্তনীয়। লর্ড কার্জন এ রকমটিই ভাবতেন। ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ কার্জন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের জন্য বাংলা সফরে আসেন। কাজটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর করতে পারতেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি।

বঙ্গভঙ্গের ফলে কোলকাতার এলিট স্বার্থে আঘাত লাগে। কোলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ার সুবাদে এই এলিটরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করছিল। কোলকাতা থেকে ভারত সরকারের সদর দফতর অন্যত্র স্থানান্তরের প্রস্তাব ১৮৬৮ সালেও উত্থাপিত হয়েছিল। কোলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের প্রস্তাবের প্রতি বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে সমর্থন এসেছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকারের ওপর কোলকাতার বাড়াবাড়ি রকমের প্রভাব বোম্বাই ও মাদ্রাজে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তারা ছাড়াও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও কোলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেয়ার বিরোধী ছিল। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মাধ্যমে রাজধানী স্থানান্তর না করার জন্য তারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। এই কৌশল প্রয়োগ করেও সুবিধা করে উঠতে না পেরে তারা 'ইংলিশ ম্যান' ও 'ক্যাপিটাল অ্যান্ড কমার্স' পত্রিকায় কলাম লিখে তাদের অসন্তোষের কথা প্রকাশ করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কোলকাতা-কেন্দ্রিক স্বার্থবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উদ্ভব ঘটে। সত্তর বছরের কালক্ষেপণ ও সিদ্ধান্তহীনতার ফলে প্রশাসনিক সমস্যা এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে, আর বিলম্ব করা মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতো। ১৯০৩ সালে ইন্ডিয়ান পুলিশ কমিশনের রিপোর্টে পূর্ববঙ্গের প্রতি প্রশাসনিক অবহেলার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ কার্জনের প্রস্তাব হোয়াইট হলে প্রেরিত হয়। ৯ জুন হোয়াইট হল প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রংপুর, পাবনা, মালদা ও বগুড়া জেলাসহ বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হল। বাংলার পশ্চিম অংশ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার

www.pathagar.com

একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হলো। কিছু জমিদরি এলাকা ছাড়া সম্বলপুর জেলা সেন্ট্রাল প্রভিন্স থেকে ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির বেঙ্গল ডিভিশনে স্থানান্তর করা হলো।

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজের শাসনকে এ দেশের তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের মুক্তি অর্জনের সমার্থক ভেবেছিল। মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন তারা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিল। সে কালের কিছু হিন্দু ভদ্রলোকের লেখায় এ অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে।

মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ১৮৬৬ সালে তারাকৃষ্ণ হালদার 'রাজভক্তি' বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, "পূর্ব্বকালে যখন এই দেশ হিন্দু জাতির শাসনাধীন ছিল তখন রাজগণের পক্ষপাতিতা দোষে জাতি বিশেষ অপর সমস্ত জাতির উপর সম্পূর্ণ প্রভূত্ব করিতেন, ঐ সকল জাতিকে স্বর্গ বা নরকগামী করণের কর্ত্তা ছিলেন।.... যখন এই রাজ্য যবনদিগের হস্তে ছিল তখন তাঁহারা হিন্দুবর্গকে নাস্তিক বা অধার্ম্মিকের শেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। স্বজাতি প্রজাবর্গের প্রতি যাবতীয় বিষয়েই অনুগ্রহ, হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সর্বতোভাবেই নিগ্রহ করিতেন।... ব্রিটিশ জাতির রাজনিয়মাবলীতে এ সকল দোষের লেশও নাই, তাঁহারা আপন জাতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাকে এবং এ দেশস্থ ডোম প্রভৃতি যৎপরোনাস্তি নীচ ব্যক্তিকে বিচারকালে সমান দেখেন।... ঐ জাতির, পক্ষপাতশূন্যতা গুণের অধিক প্রশংসা কি করিব।"

তৎকালীন হিন্দু সমাজে যে জীর্ণ অধঃপতিত অবস্থা, তার জন্য দায়ী মনে করা হতো মুসলমান শাসকদের। ১৮৭৬-এ ভোলানাথ চক্রবর্তী নামে একজন বক্তৃতা দিয়েছেন, "যে দিন যবনের উষ্ণীষ বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করে, সেই দিন হইতেই এদেশের দুর্ভাগ্য ও অবনতির সূত্রপাত হয়। নিষ্ঠুর যবনশাসনে এদেশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইয়া যায়। যেমন এক প্রবল বাত্যা আসিয়া বন উপবন ভগ্ন ও হতশ্রী করে, সেইরূপ নৃশংস দুরাচার যবন জাতি আসিয়া আমাদের জন্মভূমি বঙ্গভূমির সমুদয় সুখসৌভাগ্য বিনষ্ট করিয়াছিল। অজস্র অত্যাচার স্রোত সহ্য করিয়া নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া বঙ্গ সন্তানেরা নিতান্ত নির্বীর্য ও হীনসাহস হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম বিকৃতভাব ধারণ করে। স্ত্রী শিক্ষা একেবারে রহিত হয়। যবনাক্রমন নিবারণ জন্য স্ত্রীজাতিকে নিভৃত নির্জ্জন গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইতে লাগিল। এক সময় দেশের এমনি দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ধনীর ধন, মানীর মান ও সতীর সতীত্ব সমূহ বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।" ভোলানাথ চক্রবর্তী ভেবেছিলেন স্বজাতির সমাজ সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন একান্তভাবেই ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল। তিনি লিখেছিলেন, "সকল বিষয়েরই সীমা আছে। যখন মুসলমানদিগের অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন জগদীশ্বর তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় বিধান করিলেন।... যে দিন এদেশে ব্রিটিশ পতাকা প্রথম উড্ডীন হয়, সেই দিন হইতেই এদেশে পুনঃসৌভাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বলুন দেখি, যদি এ পর্যন্ত

www.pathagar.com

যবনাধিকার অব্যাহত থাকিত, তবে আজ দেশের কি দশা ঘটিত। অতএব একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে পরমেশ্বরের মঙ্গলের জন্য ইংরেজ জাতিকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। ব্রিটিশ অধিকারে যবনদিগের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে।... যবন শাসনের সহিত ব্রিটিশ শাসনের তুলনাই হইতে পারে না। অন্ধকার ও আলোকে যত অন্তর, দুঃখ ও সুখে যত প্রভেদ, যবন শাসন ও ব্রিটিশ শাসনে তদাপেক্ষাও অধিক প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ'-এ মুসলিম শাসনের বিদায় ও তার পরিবর্তে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। ইংরেজ শাসন থেকে হিন্দু সম্প্রদায় যে সুফল প্রত্যাশা করে এবং সেই সুফল লাভের জন্যই ইংরেজের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করা উচিত– এমন মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের চরিত্র সত্যানন্দ, চিকিৎসক ও মহাপুরুষের কথোপকথনে। সেই কথোপকথনটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, এর মধ্য দিয়েই হিন্দু মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য প্রতিভাত হয়ে উঠেছে : "সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দ মঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।' সত্য। চলুন– আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম– সেই সময়ে আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল? যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণী হত্যার প্রয়োজন নাই।'

সত্য। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই– এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না– তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল। শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, 'হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে'? তিনি বলিলেন, 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।' সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্প নিরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না– আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।'

".... প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে– কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা

www.pathagar.com

আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই– শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোক শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বিহর্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বেশ সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে– নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান- ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, 'হে মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?'

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক– অর্থ সংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেননা, রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস– জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন! আমি জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখিনা– জ্ঞানে আমার কাজ নাই– আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে- মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ– ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।"

বঙ্গভঙ্গ-পূর্ব মুসলিম সমাজ

১২ আগস্ট ১৭৬৫ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। সম্রাট এক ফরমানের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানির অধিকার প্রদান করে। দেওয়ানির অধিকার পাওয়ার অর্থ হলো এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের অধিকার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দমন, লুণ্ঠন ও দুঃশাসনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কোম্পানি শাসনের দুরাচার সত্ত্বেও এ দেশেরই এক শ্রেণীর মানুষ কোম্পানির শাসনকে আগ্রহের সঙ্গে বরণ করে নেয় এবং একে নিজেদের মুক্তি ও পরিত্রাণ রূপে চিহ্নিত করে। তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পলাশীর বিপর্যয়কে মুসলমানরা গণ্য করে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে, অপরদিকে হিন্দুদের কাছে এটি ছিল মুসলিম শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মানসিকতা তাদের লেখা বইপুস্তক, তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও তাদের দ্বারা সম্পাদিত পত্র পত্রিকায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২০ জুন ১৮৫৭ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "এই রাজ্যই তো

www.pathagar.com

রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপে স্বাধীনতা, পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম্মকর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখী হইয়াছি; কোনো বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংল্যান্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি... যবনাধিকারে আমরা ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত।" দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মানসিকতাকে ইংরেজ শাসকরা এক মহাসুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা দেখল এই মানসিকতাকে ব্যবহার করে তারা এ দেশবাসীকে বিভক্ত করে রাখতে পারবে। যার ফলে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে পারবে। ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত এই নীতি DIVIDE & RULE পলিসি হিসেবে পরিচিতি পায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত বহু হৃদয়বিদারক রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডির জন্ম দেয়। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত 'The Indian Musalmans' গ্রন্থটি এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মুসলমান সমাজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হান্টার লিখেছেন, "ভারতীয় মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সহানুভূতিহীনতা, অনুদারতার অভিযোগ করে– অর্থভাণ্ডার আত্মসাৎকারী এবং মুসলমানদের প্রতি গুরুতর অন্যায়কারী বলেও তাদেরকে দোষ দেয়। কারণ মুসলমানরা দেখল, তাদেরকে সব সরকারী পদ ও ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করা হল। এর ফলে ভারতে প্রায় ৩ কোটি অধিবাসী ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভয় পেতে লাগল।"

বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বণ্টন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ১৮৭১

১৮৭১ সালের এপ্রিলের এই পরিসংখ্যান হান্টার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :

	Europeans	Hindus	Musalmans	Total
Covenanted Civil Service appointed in England by the crown	260	0	0	260
Judicial officers in the non-Regulation Districts	47	0	0	47
Extra Asst. Commissioners	26	7	0	33
Deputy-Magistrates & Deputy collectors	53	113	30	196
Income Tax Assessors	11	43	6	60
Registration Department	33	25	2	60
Judges of Small Cause Court and Subordinate Judge	14	25	8	47
Munsifs	1	178	37	216
Police Department Gazetted officers of all grades	106	3	0	109
Public Works Dept. Engineer Establishment	154	19	0	173
Public Works Dept. Subordinate Establishment	72	125	4	201
Publice Works Dept. Account Establishment	22	54	0	76
Medical Dept. Officers attached to Medical College, Jails, Charitable Dispensaries, Sanitation and Vaccination Establishment and Medical Officer in charge of Districts etc.	89	65	4	158
Dept. of Public Instruction	38	14	1	53
Other Depts. Such as Customs, Marine Survery, Opium etc.	412	10	0	422
Total	1338	681	92	2111

www.pathagar.com

W. W. HUNTER শুধু সারণি উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি তিনি এর বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শতবর্ষ আগে মুসলমানরা সকল রাষ্ট্রীয় দফতরের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ একচেটিয়াভাবে ভোগ করতো। হিন্দুরা পূর্বতন এই বিজয়ীরা টেবিল থেকে যেসব খুদকুঁড়ো ফেলে দিত সেগুলোই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করত। ইংরেজরা কাজ করত ফ্যাক্টর ও ক্লার্ক হিসেবে। উপর্যুক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের অনুপাত সাত ভাগের এক ভাগেরও কম। ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে হিন্দুদের অনুপাত অর্ধেকেরও বেশি। আর ইউরোপীয়দের সঙ্গে মুসলমানদের অনুপাত চৌদ্দ ভাগের এক ভাগেরও কম। যে জাতি এক সময় পুরো সরকার ও রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্বে ছিল, প্রশাসনিক কাঠামোতে তাদের অবস্থান তেইশ ভাগের এক ভাগেরও নিচে নেমে এসেছে। এই চিত্র শুধু গেজেটেড পদের জন্য প্রযোজ্য। গেজেটেড পদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টনের বিষয়টির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হতো। কিন্তু প্রেসিডেন্সি টাউনের কম গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানদেরকে আরো নগ্নভাবে বাদ দেয়া হয়। এখন সরকারের খুব কম বিভাগই আছে যেখানে মুসলমানরা পোর্টার, ম্যাসেঞ্জার, ইংকপট ফিলার এবং পেন ম্যান্ডার-এর ওপরের কোনো পদ আশা করতে পারে। ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে W. W. HUNTER ভূমির রাজস্ব আদায়, পুলিশ প্রশাসন, আইন আদালত ও সেনাবাহিনী থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদকে দায়ী করেন। এ ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ভূ-স্বামীরা উচ্ছেদ হয়ে যায়। ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে কোর্ট-কাচারির ভাষা হিসেবে প্রবর্তন মুসলমানদের চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা হিসেবে কাজ করে। মুসলমানরা ইংরেজি ভাষার প্রতি যে অনীহা প্রকাশ করে সেটাই তাদের চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের কবলে ফেলে। মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা W. W. HUNTER-এর একটি বাক্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well born Musalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich."

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন তখন সময়টা ছিল প্রতিকূল। বঙ্গদেশে তথাকথিত বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হচ্ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পুনর্জাগরণবাদকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মতবাদ হিন্দু মানসিকতার কাছে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বলা হলো, বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিদেশী পণ্য বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়। গড়ে উঠল স্বদেশী আন্দোলন– গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। এসব সংগঠন অস্ত্র ও গোলাবারুদ যোগাড় করতে থাকল, তৈরি করল বোমা।

বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় রকমের বাঁক পরিবর্তন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গের প্রতি গোড়া থেকে সমর্থন তো ছিলোই না বরং ছিল তীব্র বিরোধিতা। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেসের সম্মেলনে তার সভাপতির ভাষণে বললেন, 'A cruel wrong has been inflicted

www.pathagar.com

on our Bengalee brethren and the whole country has been stirred to its deepest depth with sorrow and resentment as has never been the case before'.

ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ শাসনকে তাদের পরিত্রাণরূপে দেখতে পেয়েছিল। বিদেশী শাসকদের সহায়তা ও সুযোগ লাভের মধ্য দিয়ে তারা আত্ম-উন্নতির পথ সুগম করতে চেয়েছে। ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী মনোভাবের মূল কারণ ছিল দেড় শ' বছর ধরে অর্জিত আনুকূল্য হারানোর ভীতি। বঙ্গভঙ্গের ঘটনা তাদেরকে হঠাৎ 'দেশপ্রেমিক' করে তুলল। বিলেতি পণ্যের বহ্নি উৎসব শুরু হলো। গড়ে উঠল বেশ ক'টি স্বদেশী বিদ্যালয়। রাজনীতির প্রতি এতকাল যাবৎ যাদের কোনো উৎসাহ ছিল না সেইসব নারী-পুরুষ ও শিশুরা রাজপথে বিক্ষোভে শামিল হলো। এইসব বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি। ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ অরবিন্দ ঘোষ কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে আইরিশ ধাঁচে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের সূচনা ঘটালেন। কংগ্রেসের চরমপন্থীদের নেতৃত্বের আসনে বরিত হলেন তিনি। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে এই সন্ত্রাসবাদী দর্শনের প্রচার শুরু করেন অরবিন্দ। ১৯০৬ সালে অরবিন্দ তার ভাই বারীন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'যুগান্তর' পত্রিকাটিরও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অরবিন্দের দর্শনে ধর্মীয় হিন্দুত্ব ও বিপ্লববাদ একাকার হয়ে গিয়েছিল। যুগান্তরের অগ্নিশ্রাবী ভাষ্য শত-সহস্র তরুণদের বিপ্লবী উন্মাদনায় মাতাল করে তুলল। বাংলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠল শত শত সন্ত্রাসবাদী সমিতি। ঢাকায় অনুশীলন দলের পাঁচশত শাখা গড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীদের কঠোর হাতে দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতিবাদ এতই প্রবল আকার ধারণ করল যে ফুলার 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। তিন মাস পর ভারত সরকার ফুলারকে বলির পাঁঠা সাজিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অঙ্গ জঙ্গিবাদী মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, খোদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন, এক রাতে দুই বাঙালি তরুণ তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল যে, তারা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে গুলি করার পরিকল্পনা করেছে এবং তারা সে রাতেই এ প্রতিজ্ঞা পালন করবে। তার গুর্খা সৈন্যরা বানারীপাড়ায় নারীদের সম্ভ্রমহানি করেছে। তারা প্রতিশোধ নিতে চায়।

ব্রিটিশ সরকার এক পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গকে একটি নিষ্পন্ন বিষয় ঘোষণা করলে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। ২১ জুলাই ১৯০৬ কোলকাতায় এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশের পর ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কর্মচারীরা হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত কাজ বন্ধ করে দিল। এই ধর্মঘট আসানসোল থেকে বিহারের জামালপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। শ্রমিকরা একটি রাজনৈতিক সভায় যোগদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল। ১৯০৫'র হেমন্তকাল থেকে কোলকাতা ও তার আশপাশের এলাকা উপর্যুপরি ধর্মঘটে অচল হতে শুরু করে। এইসব ধর্মঘটের মধ্যে রয়েছে গভর্নমেন্ট প্রেস অব ইন্ডিয়া ও বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে প্রিন্টার ও কম্পোজিটারদের ধর্মঘট, হাওড়ার বার্ন আয়রন ওয়ার্কসের ভারতীয় করণিক ও সহকারীদের ধর্মঘট, হুগলির জুট মিলগুলোতে ধর্মঘট ইত্যাদি। এমনকি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজকর্মও বাধাগ্রস্ত হলো। বাংলার বাইরে

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপক গোলযোগের খবর আসতে থাকল যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বম্বে প্রেসিডেন্সি ও মধ্য প্রদেশ থেকে। পাঞ্জাবে বর্ণবিদ্বেষবাদী ধ্বনি 'আর্যাবর্ত আর্যদের জন্য' উচ্চারিত হতে থাকল। উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের ভারতীয় প্রবক্তারা নিজেদের আর্য পরিচয়ে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে আর্য সমাজ নেতা লালা লাজপৎ রায় কোলকাতায় এলেন। ১৯০৭ সালে ভারত সরকার লাজপৎ রায়কে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে দ্বীপান্তরিত করল।

বাল্ গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করলেন। তিলকের সঙ্গে অরবিন্দ ও বিপিন পালের চরমপন্থী দলগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৭ সালে কোলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থীরা তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচন করতে গিয়ে উদারপন্থীদের দ্বারা পরাজিত হলো। এর পরের বছর সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে তারা এমনভাবে কোণঠাসা হলো যে দশ বছরের জন্য তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না। হিন্দু চরমপন্থীদের উগ্রপন্থা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তীব্র অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। মুসলমানদের কাছে আর্য শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব, 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ও মাতৃভূমিকে দেবী কালীর সঙ্গে তুলনা একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে গান্ধী স্বরাজ ও খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু চরমপন্থী ও মুসলমানদের কংগ্রেসের পতাকাতলে একাট্টা করার কৌশল গ্রহণ করেন।

যতই সময় গড়াতে থাকল ততই ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সুর চড়া হতে থাকল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার চারটি পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকার পক্ষ থেকে বলা হলো, কোনো মামলা মোকদ্দমাই তার অবস্থানকে খর্ব করতে পারবে না। মামলায় যাদের সাজা হলো তারা সবাই রাতারাতি জননন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হলো। একজন মুদ্রাকরের দণ্ড হলে অন্যজন দ্রুততার সঙ্গে মুদ্রাকর হিসেবে নিবন্ধিত হতে থাকল। ৩০ জুলাই ১৯০৭ সরকার 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার কার্যালয়ে অভিযান চালায়। বিপিন চন্দ্র পাল পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেও এটি প্রধানত চালাতেন অরবিন্দ। চিফ প্রেসিডেন্সি কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ডি এইচ কিংসফোর্ডের আদালতে অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বিপিন পালকে হাজির করা হলে আদালতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত বিপিন পালকে আদালত অবমাননার অপরাধে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। আদালতের রায় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষে উপস্থিত জনতা সমস্বরে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড রাগান্বিত হয়ে স্লোগান দেয়ার জন্য ১৬ বছর বয়স্ক কিশোর সুশীল সেনকে গ্রেফতারের আদেশ দেন এবং তাকে পনের ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান করেন। সুশীলের ওপর যখন বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছিল তখন প্রতিটি আঘাতের জবাবে সে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিচ্ছিল। ভারত সচিব স্যার জন মোরলে কিংসফিল্ডের এই বর্বরতার নিন্দা জানাতে বাধ্য হন। বেত্রদণ্ডের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের তীব্রতায় সরকার কিংসফোর্ডকে বিহারের মোজাফ্ফরপুরে বদলি করে।

www.pathagar.com

৩০ এপ্রিল ১৯০৮ অমাবস্যার রাতে সন্ত্রাসবাদীরা মোজাফ্ফরপুরে আঘাত হানে। কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করে ছোড়া বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মোজাফফরপুর বারের প্লিডার পিঙ্গল কেনেডির স্ত্রী ও তরুণী কন্যার ওপর গিয়ে পড়ল। তারা নিহত হয়। ঘাতকদের একজন প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে এবং অন্যজন ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে বীরের মর্যাদা অর্জন করল। ছাত্রসমাজ তার জন্য শোক প্রকাশ করল। হাটবাজারে তার ছবি বিক্রি হতে থাকল। তরুণরা তার নামাঙ্কিত পাড়ের ধুতি পরিধান করতে শুরু করল। ব্রিটিশ শাসকরা অমাবস্যার রাতে হত্যাকাণ্ডের বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পেল। কারণ, অমাবস্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতকেই কালী দেবীর পূজার জন্য আদর্শ মনে করা হয়। ঘাতকরা বোমা হামলার আগে বিশ দিন ধরে মোজাফফরপুরে অবস্থান করছিল। এর আগে এক জনসভায় একজন ডাক্তার দেবী কালীর উদ্দেশে 'শ্বেতছাগ' বলি দানের আহ্বান জানিয়েছিল। এই 'শ্বেতছাগ' শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় বৈ আর কী হতে পারে!

সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা-খুনের অভিযান অব্যাহত থাকল। মোজাফফরপুরের ঘটনার দু দিন পর কোলকাতার মানিকতলার এক বাড়ি থেকে দেশী বোমা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বইপত্র উদ্ধার করল পুলিশ। পরদিন অরবিন্দ উত্তর কোলকাতা থেকে গ্রেফতার হলেন। প্রায় একই দিনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তিলক গ্রেফতার হলেন। তিনি 'কেসারী' পত্রিকায় মোজাফফরপুর হত্যাকাণ্ডের ওপর দুটো লেখা লিখেছিলেন। তিলকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে মিল শ্রমিকরা ব্যাপক ধর্মঘটে গেল। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে লেনিন এই ধর্মঘটকে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে অভিনন্দন জানান। তিলককে ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে মান্দালয় জেলে বন্দী করা হলো।

ব্রিটিশ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ সত্ত্বেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড রোধ করা সম্ভব হলো না। ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ আলীপুর জেলে মানিকতলা ষড়যন্ত্রের দু'জন বিচারাধীন আসামি রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে সন্ত্রাসবাদীরা বঙ্গভঙ্গের অন্যতম স্থপতি বিবেচনা করত। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন ঘাতক সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা প্রচেষ্টার লক্ষ্যবস্তু। তার প্রাণনাশের জন্য চার-চারবার আঘাত হানার চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে তিনবার প্রাণনাশের চেষ্টা চালানো হয় যখন তিনি ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। নারায়ণগঞ্জে এ রকম একটি প্রচেষ্টার সময় বিস্ফোরণে রেল ট্র্যাক ও ইঞ্জিন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ফ্রেজার অক্ষত থাকলেন। চতুর্থবার কোলকাতার YMCA হলে ফ্রেজারকে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এবারও ফ্রেজার বেঁচে যান। কারণ, ১৮ বছর বয়সী যে যুবক তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল সে জানায় যে, রিভলবারটি ফেঁসে গিয়েছিল।

১১ ডিসেম্বর ১৯০৮ ভারত সরকার ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন পুনরুজ্জীবিত করে। এই রেগুলেশন অনুযায়ী নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বিনা বিচারে দ্বীপান্তরিত করা হয়। সুবোধচন্দ্র মল্লিক ছিলেন এঁদের একজন। জানুয়ারি ১৯০৯ ঢাকার অনুশীলন সমিতিসহ কয়েকটি গোপন সংঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

অরবিন্দ ঘোষ তখনো আলীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ জল্লাদের রজ্জু এড়িয়ে পালিয়ে যান। বাল্ গঙ্গাধর তিলক তখনো মান্দালয়ের জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। মে ১৯০৯ ভাইসরয় মিন্টো হৃষ্টচিত্তে ঘোষণা করলেন হাতে গোনা কিছু বিকারগ্রস্ত ছাত্র গোপন সমিতিগুলোর কর্মকাণ্ডে জড়িত; নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ায় ও ক্রমান্বয়ে অনুসারীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় গোপন সমিতিগুলো ও তাদের বিপ্লব মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন কুড়াতে ব্রিটিশ সরকার কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯০৯ এর মাধ্যমে সাংবিধানিক ছাড়ের কথা ঘোষণা করল। এটি 'মর্লি-মিন্টো সংস্কার' নামে পরিচিত হলো। এই সংস্কার লর্ড কার্জনের মনঃপূত ছিল না। ইংল্যান্ডে তিনি সংস্কারের অশুভ ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন যে তাঁর দৃঢ় মত হচ্ছে– এতে করে ভারত সরকার প্রজাপালন ও দরিদ্র শ্রেণীর হিতকরী দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী যে জঙ্গি আন্দোলন প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার জন্য চরমপন্থী হিন্দু নেতাদের দায়ী করা হলেও 'উদারপন্থী' হিন্দু নেতৃত্বও এই আন্দোলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করত। ডিসেম্বর ১৯০৫ কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, 'A cruel wrong has been inflicted on our Bengalee brethren and the whole country has been stirred to is deepest depth with sorrow and resentment as has never been the case before'.

উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে ব্রিটিশশাসিত বঙ্গদেশের যে গৌরব তার একটি বড় কারণ বাঙালি-হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসমর্থন অর্জনের নতুন কিছু কৌশল ভারতীয় রাজনীতিতে চালু হয়। ১৯০৫-এর পর ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার ভাগ হয়। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিস্ময়ের বিষয়, এ যাত্রা বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য হলো না, বরং যারা ১৯০৫-এ এর বিরোধিতা করেছিল তারাই এর প্রবল প্রবক্তায় পরিণত হলো। ১৯৪৭-এ দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলা যখন সুনিশ্চিতভাবে ভাগ হয়ে যায়, তার আগে প্রদেশটিকে ভাগ করার জন্য সংগঠিতভাবে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল বঙ্গদেশীয় সমাজের সেই অংশ যারা ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সামাজিক ইতিহাসের পরিভাষায় এরা 'ভদ্রলোক' অভিধায় পরিচিত হয়েছে। চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে 'ভদ্রলোক' রাজনীতি তার বৃত্তপরিক্রমা সমাপ্ত করল।

হিন্দু ভদ্রলোকদের সাম্প্রদায়িকতা

ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক প্রায়ক্ষেত্রেই ছিল অত্যন্ত জটিল, আবার কখনো বা সম্প্রদায়বোধ সম্পর্কে নিস্পৃহ। সুগভীর তাৎপর্য অনুধাবন না করে সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিপরীতার্থক মনে করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর থেকে বিযুক্ত। এভাবে দেখলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। ব্যাপক জনসমর্থন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীক ও

www.pathagar.com

ধর্মবোধকে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দার্শনিক ও আদর্শিক চরিত্রও সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভারতীয় সমাজের মৌলিক একক হল ধর্মীয় বিচারজাত 'জাতি' বা সম্প্রদায়। এই জাতীয়তাবাদীদের ধর্মনিরপেক্ষতা বড়জোর 'সর্বধর্ম সদ্ভাব' অর্থাৎ সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করবে। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা ও সদ্ভাবের কথা বলা হলেও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব জাতীয় পরিচয়কে প্রতিকায়িত করেছে ধর্মীয় পরিচয়ে। তাদের দৃষ্টিতে ভারতীয় হওয়া মানে হিন্দু হওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' [বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১৩১১ (১৯০৪)] প্রবন্ধে এই দর্শনের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "বহুর মধ্যে ঐক্য– উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন– ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্যই সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়। ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না– এইখানে তাহারা একটি সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই দেশ বিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের"। ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বকে সমার্থক ভেবে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরো যারা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। এইসব ঋষি পুরুষদের লেখায় যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরাও একই মতাদর্শ প্রচার করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে হিন্দু ভদ্রলোকগোষ্ঠী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, তাঁরা অনেকেই ছিলেন পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু সেই শিক্ষা তাদের মানসলোকে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। চিত্তবৃত্তির দিক থেকে এরা ছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। অরবিন্দ ঘোষ মাত্র সাত বছর বয়সে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন। লন্ডন ও কেমব্রিজে শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি এমন এক রাজনৈতিক বেদমন্ত্রে বিশ্বাস করতেন যার মূল কথা ছিল দেশ-মাতা দেবী মা কালীর সমতুল্য। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অরবিন্দ ঘোষ এই আলোকে তার জাতীয়তাবাদকে উপস্থাপন করেন। বিপিন চন্দ্র পাল ও সরলা দেবী উভয়েই ছিলেন পুরাতন ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত। তাঁরা কালী পূজা ও শিবাজী উৎসবকে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণকে দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দলভুক্ত হওয়ার জন্য শাক্ত দর্শনে উজ্জীবিত হয়ে শপথ গ্রহণ করতে হতো। মুসলমানদের মধ্যে কমরেড মুজফফর আহমদ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অনুশীলন দলের সদস্যভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে মন্দিরে গিয়ে কালী মূর্তির সামনে রক্তশপথ নিতে বলা হয়। মুজফফর আহমদ ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। মুজফফর আহমদ লিখেছেন, "বাংলায় সন্ত্রাসবাদী

www.pathagar.com

বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের আগেই তাঁদের দল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁদের আরও বেশী প্রেরণা জুগিয়েছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে বাংলাদেশেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেশি দানা বেঁধেছিল। বাংলার বাইরেও তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু বাংলার মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনে যে পরিবর্তন আসছিল এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যে রোমাঞ্চ ছিল, আমার মনে হয় হয়তো আমি তাতে যোগ দিতে পারতাম। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায় (১৯০৪-১৯১৭) কঠোরভাবে হিন্দু ধর্ম-অনুশাসিত ছিল। এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় আমার স্থান হত না। অতীতে আমাদের দেশে ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন কোনো রাজনিতিক আন্দোলন হয়নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলনই বা কী করে ধর্মনিরপেক্ষ হবে?"

এমনকি চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁকে বাহ্যিকভাবে পুরোপুরি অ্যাংলিসাইজড (Anglicised) বলে মনে হতো তিনিও গভীরভাবে বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত ছিলেন এবং বৈষ্ণব মরমি কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁর তরুণ সহযোদ্ধা সুভাষ বসু ছিলেন রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। এসব তথ্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ভদ্রলোক সমাজের বাইরের রূপটিকে পাল্টে দিলেও তার অন্তরকে পাল্টাতে পারেনি। তারা মনে-প্রাণে হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন। এতে দোষের কিছু ছিল না। সমস্যা দেখা দিল যখন তারা তাদের মনের গভীরে লালিত হিন্দুত্ববাদকে রাজনীতির এজেন্ডাভুক্ত করে নিলেন। এইসব ব্যক্তি একদিকে ইউরোপের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার প্রশংসা করতেন, আবার অন্যদিকে তাদের গভীর আস্থা ছিল হিন্দু আধ্যাত্মবাদী ঐতিহ্যে। ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা' নামক সংগঠনটির পরিচালন ব্যবস্থা ছিল আধুনিক। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদের কথা শুনলে সংগঠনটিকে আধুনিক সংস্থা বলে মনে হলেও এর প্রধান কর্মসূচি ছিল হিন্দু বিধবাদের মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে 'সতী' হওয়ার অধিকারের (!) প্রতি সমর্থন যোগানো। ধর্মসভার পরবর্তী প্রজন্ম ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তাদের এই স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামোগতভাবে কল্পিত হয়েছিল একটি আধুনিক রাষ্ট্রসত্তারূপে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের মর্মবস্তু হিন্দুত্ববাদী। বাংলাদেশের হিন্দু ভদ্রলোক নেতৃত্ব হিন্দু বাংলার পতাকাবাহী সেনাপতি হওয়ার কথাই ভেবেছে। ১৯৪৬-৪৭-এ এরাই বাংলা ভাগ করার দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছিল।

১৬ অক্টোবর ১৯০৫ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়। হিন্দু ভদ্রলোক নেতৃত্বের উদ্যোগে দিনটি 'শোক দিবস' হিসেবে পালন করা হয় এবং কোলকাতায় ফেডারেল হলের শিলান্যাস করা হয়। এই ফেডারেল হলেই পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ১৬ অক্টোবরের সভা থেকে স্বদেশী আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীরা 'বন্দে মাতরম'কে রণধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করে।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতারা ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, আনন্দ

www.pathagar.com

মোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অম্বিকা চরণ মজুমদার ও এ কে মিত্র। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী প্রধান সংগঠনগুলো ছিল ডন সোসাইটি, বন্দে মাতরম সম্প্রদায়, এন্টি সারকুলার সোসাইটি ও স্বদেশী সমাজ। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন, "উভয় বঙ্গের মুসলমানদের ভিতরে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ আন্দোলনে খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের ভিতরে মিস্টার আব্দুর রসুল (ব্যারিস্টার), আব্দুল হালীম গজনবী (পরে স্যার আব্দুল হালীম গজনবী), মৌলবী মনিরুজ্জামান ইসলাম আবাদী, মৌলবী কাজেম আলী (কাজেম আলী মাস্টার নামে খ্যাত ছিলেন), সৈয়দ ইসমাইল হোসায়ন সিরাজী, বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেম, মৌলবী মুজীবুর রহমান ('দি মুসলমান' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক), মৌলবী মুহম্মদ আকরম খান (এখন ঢাকার 'আজাদ' পত্রিকার মালিক), পাটনার মিস্টার আলী ইমাম (পরে স্যার আলী ইমাম), তাঁর ভ্রাতা মিস্টার হাসসান ইমাম, মিস্টার মুজহারুল হক, ব্যারিস্টার, (পরে পাটনার সাদাকত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা), মৌলবী লিয়াকত হোসায়ন ও ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমি বঙ্গভঙ্গর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনো আন্দোলনেই যোগ দিইনি। তখন আমার যে বয়স ছিল তাতে কোনো এক পক্ষে যোগ দিলে আমার পক্ষে তা মোটেই বেমানান হত না। আমার বয়সের ছেলেরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তবে, সাম্প্রদায়িক কোনো ব্যাপারে আমি একেবারেই যোগ দিইনি একথা বললে অপলাপ করা হবে! বিশেষ মুসলিম দাবি দাওয়ার সভা-সমিতিতে আমি যোগ দিয়েছি। আমি সে সময়ে ধার্মিক মুসলমান ছিলাম। দিনে পাঁচবার নামাজ না পড়লেও রমজানের পুরো মাস উপবাস করতাম।"

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর 'আমার সোনার বাংলা' গানটি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ (২২ ভাদ্র ১৩১২) সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ আগস্ট ১৯০৫ কোলকাতার টাউন হলের সভায় এই গানটি বাউল সুরে গীত হয়েছিল। বর্তমানে এই গানটিই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গে ক্ষুব্ধ ও আবেগাপ্লুত হয়ে আরো অনেক গান ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি লিখলেন,

'বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান' ॥

এটিই ছিল বিখ্যাত 'রাখি সঙ্গীত'। তিনি লিখলেন,

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

জননীরূপী বাংলাদেশের এই অপরূপ ছবি আজকের দিনে আমাদের মনে স্বদেশপ্রীতির অনুভবকে জাগ্রত করে। এই গানটি স্বদেশ প্রেমের গান হিসেবে বাংলাদেশের নানা অনুষ্ঠানে দরদ ভরা কণ্ঠে গীত হয়। কিন্তু এই গানটিও রচিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'ও আমার দেশের মাটি', 'সার্থক জন্ম আমার' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গে আবেগ আপ্লুত হয়ে রবীন্দ্রনাথ মেতে উঠেছিলেন এবং গানে গানে অনেককে মাতিয়ে তুলেছিলেন এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বেশি দিন এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি থাকতে পারেননি। আন্দোলনের "গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয়নি। এই ধরনের উচ্ছ্বাস-প্রধান হাতে-গরম হুজুগে কর্মকাণ্ড, এই ধরনের মধ্যবিত্ত-স্বার্থের মধ্যে ঘুরপাক-খাওয়া আন্দোলন যে রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হতে পারে না তা বোঝা শক্ত নয়। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দলিল হচ্ছে 'ঘরে-বাইরে', 'উপন্যাসখানি"। [সত্যেন্দ্রনাথ রায়, স্বদেশ চিন্তা : ভূমিকা, ১৯৮৮]

আমরা লক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে পৌরহিত্য করেছিলেন হিন্দু ভদ্রলোকরা। এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে কোনো মুসলিম নেতার নাম নেই। বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায় কেন এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারল না সেটা রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, ইংরেজ শাসকরা হিন্দু-মুসলমান বিভেদ উস্‌কে দিতেই বঙ্গভঙ্গের আয়োজন করেছিল। এখন পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্যায় এই তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অথচ ১৯০৭ সালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে লিখলেন, "আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড় নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে। মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারেনা; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই– আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে– অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চালিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিষ্কৃতি নাই..."। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন ভদ্রলোকদের সঙ্গে চাষাদের ব্যবধান দুস্তর। এই ব্যবধান যে অবিশ্বাসের দেয়াল তৈরি করেছিল তা শুধু মিষ্টভাষণে অপসারিত হতে পারে না। গ্রামের এই চাষারা অধিকাংশই ছিল মুসলমান প্রজা। তিনি তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে আরো লিখেছেন, "আজ আমাদের ইংরেজি পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়ে বলে 'আমরা উভয়েই ভাই'– তখন এই ভাই কথাটির মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারেনা। যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গভর্নমেন্টের প্রকাশিত তথ্য তালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াইনা, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহবান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা।

www.pathagar.com

সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী' প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়– সে উদ্দেশ্য খুব বড় হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ' দেশের উন্নতি বা আর কিছু।"

সে কালে মুসলমান প্রজাদের প্রতি হিন্দু জমিদার, সমাজপতি এমনকি সাধারণ হিন্দুরা যে সামাজিক দূরত্বের নীতি অনুসরণ করত, সেটাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দূরতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। সে কারণেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে কিংবা স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুরা মুসলমানদের পাশে পায়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ওপর এক লেখায় (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩, [১৯২৭]) এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধানের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয়নি। কিন্তু কেন দেয়নি? তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল সে আশ্চর্য। কিন্তু, এত বড় আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি... আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম এ কেন তখন জবাব পেলেম, যে সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোশে বসাতেও হবে, অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরেই চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে'। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, 'আমরা পৃথক'। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম তোলা আসনে। বহু দিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোট নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না"।

সামাজিক জীবনে হিন্দুর হাতে মুসলমানের অবমাননা মুসলমানকে হিন্দুর কাছ থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এ কারণে স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারেনি। বঙ্গভঙ্গ রোধে হিন্দু ভদ্রলোকদের তোড়জোড় মুসলমানরা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখেছে। রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২১ [১৯১৪]) লিখেছেন, "হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার

www.pathagar.com

মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগীরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে, তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না; কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারও গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভীড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে, তাহা মানি তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগেনা। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না হৃদয়ে লাগে। কারণ সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া। বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্ন বস্ত্রে হাত দেয়নি, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করেছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড, ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।"

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে রণধ্বনি ছিল 'বন্দে মাতরম'। এর উৎস ছিল বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম' গান। এই গানের কেন্দ্রস্থলে ছিল দুর্গার স্তব। বঙ্কিম বাংলাদেশকে দুর্গার সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। ব্রিটিশ শাসক-বিরোধী আন্দোলন হয়ে উঠেছিল হিন্দুত্ববাদী উত্থানের আন্দোলন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে ধর্মীয় প্রতীকের জবরদস্তি প্রয়োগ হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনকে তীব্র করতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসুকে লেখা এক পত্রে (১৯.১০.১৯৩৭) লিখেছেন, "বন্দে মাতরম গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব, একথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলাদেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভূজামূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না। এবারে পূজার সংখ্যার বহু সাময়িক পত্রে দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে বন্দে মাতরম গানের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছে। সহজেই দুর্গার স্তব রূপে একে গ্রহণ করেছে। আনন্দ মঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সার্বজনীনভাবে সংগত হতেই পারেনা। বাংলাদেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায়-আবদার নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে"।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এই অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের আন্দোলন মনে করেনি। তার একটি বড় কারণ ছিল ব্রিটিশ শাসনে সুবিধাভোগী হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী মুসলমান প্রজা ও নিম্নবর্গের মানুষের ওপর অধিপতি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। বর্ণাশ্রমের ভেদবুদ্ধিজাত সামাজিক বৈষম্য মুসলমানদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মুসলমানরা তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের আপন ভাবতে পারেনি। পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের জনগণের সামাজিক মুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে গেছে। বর্তমান

www.pathagar.com

প্রজন্মের পক্ষে ধারণা করা কঠিন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ জুড়ে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কত করুণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের এক উদযোগী পুরুষ ছিলেন। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তিনি রাখিবন্ধনের উৎসবও করেছিলেন। কিন্তু তাতেও বৃহত্তর মুসলমান সম্প্রদায়ের মন জয় করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি কবিহৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। কবি আত্মজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে কবির এক গুচ্ছ লেখা থেকে বাছাই করা উদ্ধৃতগুলো বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বুঝতে সাহায্য করবে। সচেতনভাবেই এ সম্পর্কে কোনো মুসলমান লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, সেটি করলে আত্মবিস্মৃত বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলতেন। তারপরও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ যে কেউ করবে না সেটা বলা যায় না। প্রকৃত ইতিহাসের সমস্যা এই যে, অনেক সময় আমরা যেসব বিষয় এড়িয়ে যেতে চাই সে সব বিষয়কেই প্রকৃত ইতিহাস উচ্চকিত করে তোলে। তখন অসহায় বোধ করা ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্ফটিক স্বচ্ছ উপলব্ধি আলোচিত হলো। ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ঐতিহাসিক কিভাবে বিষয়টিকে মূল্যায়ন করেছেন তার ওপরও কিছু আলোকপাত করা দরকার। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার এবং এই আন্দোলনের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী মাত্রা মুসলমান সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনের প্রতি সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছিল।

Nitish Sen Gupta তাঁর `HISTORY OF THE BENGALI SPEAKING PEOPLE' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Unfortunately, the open identification of the motherland by the Swadeshi movement with goddess Durga, and encouragement in Bengal of the Shivaji festival started by Tilak in Maharashtra in 1902 to arouse the Maharashtra masses served to drive away large sections of Muslims from the anti-partition agitation which they had initially joined in sizeable numbers. Although the organizers of the Shivaji Festival in Calcutta and towns like Barisal on second thought tried to emphasize that Shivaji did not fight Islam, but only oppression and was himself secular, serious damage had already been done to Hindu-Muslim relations. Muslim masses easily fell prey to the vicious propaganda that the movement's over glorification of Hindu Shivaji against the Muslim Emperor Aurangazeb was anti-Muslim in its character, and should be opposed by all Muslims, all the more so because the agitation was directed against the creation of Muslim majority province. Thus the first great national movement from the beginning became suspect in the eyes of the majority of the Bengalee Muslims. The fallout of this psychosis was the birth of the Muslim League in Dhaka in December 1906.'

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা যখন দেয়া হয় তখন পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস'। অ্যালেন অকেটভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ এর প্রথম সভাপতি ছিলেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সত্যিকার অর্থে কখনোই হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। প্রথমদিকে বোম্বাইয়ের রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন তৈয়বজি ব্যতীত অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নেতা কংগ্রেস নেতৃত্বে আসীন হননি। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে যেসব প্রতিনিধি যোগদান করেছেন তাদের ৯০ শতাংশ ছিল হিন্দু এবং মাত্র ৬.৫ শতাংশ ছিল মুসলমান। হিন্দু প্রতিনিধিদের ৪০ শতাংশ ছিল ব্রাহ্মণ, অন্যরা উচ্চ বর্ণের হিন্দু। এর ফলে কংগ্রেসে এক ধরনের social orthodoxy সৃষ্টি হয়। সামাজিক বিষয়গুলো ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কখনোই কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপিত হয়নি। কংগ্রেসে নির্বাচিত কাউন্সিল গঠনের দাবি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতো মুসলিম নেতারা বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল এতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৮৮৮ সালের অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো যে, কোনো প্রস্তাব যদি হিন্দু অথবা মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুমোদিত না হয় তাহলে সে প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে না। ১৮৮৯ সালে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য আইনসভায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব পাস করা হলেও মুসলমানদের আশঙ্কা ঘোচানো গেল না। কারণ ১৮৯৩-এর গো-হত্যা দাঙ্গায় কংগ্রেস নীরব থেকেছে। কংগ্রেস ভেবেছে দাঙ্গার প্রতিবাদ করলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারাতে হবে। এভাবে শুরু থেকেই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভেদরেখাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

বঙ্গভঙ্গ-মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্বরিত ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সে রকম কোনো প্রতিক্রিয়া বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ করা যায়নি। একটি সমাজে জনগোষ্ঠীর কোন অংশ কী মাত্রায় এবং কী ধরণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সেটি প্রধানত নির্ভর করে ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি কতটুকু বিকশিত হয়েছে তার ওপর। বঙ্গভঙ্গের সময় বঙ্গীয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কোনো বিকাশ হয়নি। ফলে সামগ্রিকভাবে বাঙালি মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে প্রখর সচেতনতার অধিকারী ছিল না। তারা সংগঠিতও ছিল না। মুসলিম সমাজের সামাজিক অনগ্রসরতায় উদ্বিগ্ন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বঙ্গভঙ্গের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতি সবচেয়ে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নের দিনে মুন্সীগঞ্জের এক জনসভায় তিনি বলেন, 'aroused us from inaction and directed our attention to activities and struggle.'

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এলিট হিন্দুদের নেতৃত্বে যে বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায় নির্লিপ্ততার অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মুসলিম

www.pathagar.com

সমাজের এই নির্লিপ্ততা কখনো কখনো দোদুল্যমানতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বঙ্গভঙ্গোত্তর নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের পদত্যাগের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্যোদয় ঘটে। লেডি মিন্টু তাঁর জার্নালে তরুণ মুসলমানদের অনুভূতি সম্পর্কে লিখেছেন, "The younger generation were wavering, inclined to throw in their lot with the advanced agitators of the congress, then came Fuller's resignation. A howl went up that the loyal Mohammedans were not to be supported, and that the agitators were to obtain their demands through agitation." স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম' স্লোগানও তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে কোলকাতার সংবাদপত্রগুলো তাঁর বিরুদ্ধে মারমুখী প্রচারণা গড়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বিক্ষোভকারী ও সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর তুমুল বিরোধিতা শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে নতি স্বীকার করে। ফুলারকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। ফুলারের পদত্যাগ মুসলিম সম্প্রদায়ের বোধোদয় ঘটায়। এ সম্পর্কে আগস্ট ১৯০৬ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী নবাব মহসিন-উল-মুলক্-কে এক পত্রে লিখেন– "Up till now the Mohammedans of Bengal have been careless. They have now begun to feel the consequences of their carelessness. If only the Mohammedans of Bengal, instead of following the government, had agitated like the Hindus and had enlisted the sympathies of the Mohammedans of the whole of India, and raised their voice up to the parliament, they would never see these unfortunate consequences. The resignation of Sir Bamfylde Fuller has produced an unrest throughout the Mohammedans in the whole of Bengal, and their aspirations for higher education and increased rank and responsibility being subsided. Looking at it from one point of view, the Government has taught a good lesson to the Mohammedans by accepting Sir Bamfylde's resignation. It has served to awaken them after a sleep of carelessness. We shall now have to procced on the same lines as the Hindus, not only in India, but in England."

ডিসেম্বর ৩০, ৩১, ১৯০৮ অমৃতসরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাব সরকারকে জানানো প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ড. রাস বিহারী ঘোষের মন্তব্য এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিবাদে মুসলিম লীগও অমৃতসরের অধিবেশনে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই অধিবেশনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বঙ্গভঙ্গের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিপুল সংখ্যক লীগ সদস্যদের সমর্থনে গৃহীত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী

www.pathagar.com

উত্থাপিত প্রস্তাবটি বেশ বড় এবং এই প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের সুফলের দিকগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর উত্থাপিত প্রস্তাব থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব বোঝা যাবে। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর প্রস্তাবে উল্লেখ করেন, "....The duplication of the administrative machinery has not only raised the standard of efficiency in the government of the reconstituted province, but has afforded a great secutity of life and prosperity to the people. What was the state of affairs in the eastern part of the province, especially in the tracts watered by the Brahamputra, the Pudda and the Megna. They were so detouched and segregated from the centre of administrative influence that it was impossible, under the old system, to have hoped for any improvement, social, political, educational or commercial, before many long years to come.

The partition has given a new life to the people in the Eastern province. They are feeling a refreshing sense and a relief from the thralldom of.... Calcutta. They find their rights more quickly recognized and their existence and importance more adequately appreciated than they could as a mere appendage, as heretofore, of Western Bengal. They find that if... some 100 deputy magistrates and a like number of sub-deputies, munsiffs and sub-registrars have had to be appointed, these appointments went to the children of the soil, Hindus and Mohammedans. In fact, the people feel that in neglected Eastern Bengal, the people have got what Ireland has so strenuously been fighting for, I mean home-rule and not rule from Calcutta."

এফ বি ব্রাডলি বার্ট 'Romance of an Eastern Capital' নামে ১৯০৬ সালে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী 'প্রাচ্যের রহস্য নগরী' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পাওয়ায় যে প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই গ্রন্থে লেখা হয়, "ঢাকার জীবনে আবার এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। দু'শো বছর ধরে রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকার পর আবার সে রাজধানীর গৌরবময় মর্যাদা লাভ করল। এককালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। সেখান থেকে পূর্ব বাংলা কেটে নিয়ে তার সাথে আসাম জুড়ে দিয়ে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়েছে- নাম দেওয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে এর শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে। এই প্রদেশের রাজধানী হল ঢাকা। আগেকার বঙ্গদেশ এত বৃহদায়তন ছিল যে, একটি প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অত্যন্ত গুরুভার বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল এবং এর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চাদপদ ছিল বলে প্রদেশের সাধারণ অগ্রগতির সাথে তাল রক্ষা করতে পারছিল না।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রও পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কাজেই এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। বস্তুত বঙ্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত বঙ্গদেশের বাড়তি অংশটি কেটে নিয়ে এর উপর অবাঞ্ছিত ভার লাঘব করা। দ্বিতীয়ত এর জন্য একটি স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে করে পূর্ববাংলার স্বার্থ অধিকতর নিষ্ঠার সাথে রক্ষিত হয় ও এর সাধারণ অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেই বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা সম্পাদন করা হয়েছিল। আগেকার প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষের উপর। অথচ মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। কিন্তু নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

"বস্তুত বাংলা-বিভাগ সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের অভিনন্দন লাভ করেছে। এর দ্বারা যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের প্রভূত কল্যাণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব-বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানগণ নিরতিশয় অজ্ঞ এবং পশ্চাদপদ। আধুনিক অবস্থার সাথে হিন্দুরা যেমন নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা তারা পারেনি বা সেদিকে কোন আগ্রহও দেখায়নি। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই হিন্দুদের হাতে। আন্দোলনের কুশলতা জানা না থাকায় ও নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কিভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার ফলে অপরিহার্য রূপে মুসলমানেরা পেছনে পড়ে থাকে। এখন এই নয়া প্রদেশে তারা হবে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রদেশের আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গমাইল। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ নবগঠিত প্রদেশটিতে তাদের স্বার্থ স্থানীয় শাসকদের কাছে পূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে। প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার কে.সি.এস.আই ইতিমধ্যেই জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেছেন। গত ২০ আগস্ট তিনি পদত্যাগ করায় মুসলিম সম্প্রদায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। অনারেবল মি. হেয়ার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। যেসব উন্নতিমূলক কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, আশা করা যায়, সেগুলো তার আমলে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে এবং এসব কাজের সাফল্যই এই নয়া প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবে।"

বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা আসার আগেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রচারিত ইশতেহারে বলা হয়, "নতুন প্রদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি এসোসিয়েশন গঠন করা প্রয়োজন। ঐ এসোসিয়েশন সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত নানা বিষয় ও ন্যায্য অধিকার নিয়ে সরকারের কাছে মতামত প্রকাশের ব্যাপারে সকল মুসলমানের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলায় গণ্যমান্য মুসলমান ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ ঢাকার নর্থ ব্রুক হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গঠিত হয় 'মোহামেডান প্রভিনসিয়াল ইউনিয়ন'। এই সংগঠনের উদ্যোক্তারা ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের দিনকে 'বাংলার ইতিহাসে শুভ প্রভাতের সূচনা' বলে আখ্যায়িত করে। নবাব সলিমুল্লাহ এই এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য সরকার সম্ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন এবং বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সে সুযোগকে জোরদার করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এ জন্য লর্ড কার্জনকে ধন্যবাদ জানাই।" এই সংগঠনের সভাপতি হন শায়েস্তাবাদের নবাব মীর মোয়াজ্জেম, ধনবাড়ির সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও করটিয়ার ওয়াজেদ আলী পন্নীসহ নয়জন সহসভাপতি; নবাব খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ জান সচিব এবং কাজী আলাউদ্দিন আমহদ সহকারী সচিব নিযুক্ত হন।

কোলকাতার মোহামেডান লিটারারি সোসাইটিও বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। নভেম্বর ১৯০৫ এই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রচারিত এক লিফলেটে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাধ্যমতো সরকারের নীতিকে সমর্থন করা। লিফলেটে আরো বলা হয় স্বদেশী বা অন্য কোনো আবরণে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকতে হবে। এই আহ্বানে যাঁরা স্বাক্ষর প্রদান করেন তাঁরা হলেন সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ্, সহসভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ, অনারারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আবদুল হাই (শামসুল ওলামা), সদস্য আতাউর রহমান, সদস্য বেলায়েত হোসেন, সদস্য মির্জা আশরাফ আলী, অনারারি সেক্রেটারি এ এফ এম আব্দুর রহমান। অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করলেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করেন। নবাব সলিমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ এঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এক সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ভারত সরকারের কাছে 'বঙ্গভঙ্গ' পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, নাটোরের মহারাজা বাহাদুর জগদীন্দ্রনাথ রায়, রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জি, রাজা শ্রীনাথ রায়, ড. রাস বিহারী ঘোষ, লাল মোহন ঘোষ, ঢাকার খাজা পরিবারের কয়েকজন সদস্য ও খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ। এ ছাড়া ফরিদপুর জেলার কংগ্রেস নেতা আলিমুজ্জামান চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে ওই সিদ্ধান্ত রহিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। অন্যদিকে বাকেরগঞ্জের নমশূদ্ররা বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানায়। যা হোক, মুসলমান ও নমশূদ্রদের বিচ্ছিন্ন কিছু বিরোধিতা ও সমর্থনের কথা বাদ দিলেও এ কথা বলা যায় যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলধারা বঙ্গভঙ্গের পক্ষেই ছিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী মুসলমানরা পালন করে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে। আর হিন্দুরা ওই দিনটি পালন করে শোক দিবস হিসেবে। ২০ অক্টোবর ল্যান্সলর্ড হেয়ার ভাইসরয় লর্ড মিন্টুকে লেখেন, "বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপনের জন্য (১৬ অক্টোবর) আমি মুসলমানদের ২১টি সভা অনুষ্ঠানের টেলিগ্রাম পেয়েছি। অনেক সভায় লোকসমাগম হয়েছে আশাতীত। ঢাকার সভায় ২০ হাজার, ময়মনসিংহের সভায় ১০ হাজার, ফরিদপুরের সভায় ৬ হাজার ও সিলেটের সভায় ১ হাজার উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। মুসলমানরা সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স্মারকলিপি পাঠায়। সেক্রেটারি অব স্টেট মি. মর্লি বঙ্গভঙ্গকে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে মন্তব্য করায় মুসলমানরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু হাউজ অব কমন্সে প্রধানমন্ত্রী স্যার হেনরি ক্যাম্পবেলের মন্তব্যে তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গোটা পরিস্থিতি

www.pathagar.com

পর্যালোচনার জন্য তাঁর কাছে কোনো সবল যুক্তি উপস্থাপন করা হলে তিনি বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক বিবেচনা করবেন।"

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার পর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। এই অবনতির স্বরূপ বোঝার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। নভেম্বর ১৯০৬ সিরাজগঞ্জের এক বৈঠকে অভিযোগ করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য হিন্দু জমিদার ও তালুকদাররা তাদের মুসলমান রায়তদের বাধ্য করেছে। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দিলে হিন্দু মহাজনরা মুসলমানদের সুদে টাকা ধার দিচ্ছে না।

ইতোমধ্যেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিংস মারমুখী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বিশাল পরিবর্তন এসে গিয়েছিল তা কিন্তু নয়। তবুও অগ্রগতি হচ্ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছিল। ভূমি বিরোধ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুন-খারাবির ব্যাপকতা হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রদেশের নিষ্পত্তিকৃত এলাকায় ভূমির জরিপ ও অধিকার সম্পর্কিত রেকর্ড করার কাজ করা হয়। পূর্ববঙ্গে অপরাধ দমনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়, বিশেষ করে নৌ-পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যমান রাস্তাঘাটের সংস্কার ও নতুন রাস্তা তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়। নবগঠিত প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার সরকারি চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমতা বিধানের লক্ষ্যে মুসলমানদের নিয়োগ বৃদ্ধির আদেশ দেন। ফুলারের উত্তরাধিকারী লেফটেন্যান্ট গভর্নর ল্যান্সলর্ড হেয়ার তাঁর পূর্ববর্তী লে. গভর্নর ফুলারের নীতি অব্যাহত রাখার জন্য বড় লাট লর্ড মিন্টুকে লেখেন, "সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের ন্যায্য অংশ দেয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে শীঘ্রই আমাকে আদেশ জারি করতে হবে।" কিন্তু হেয়ারের প্রস্তাবিত নির্দেশনামা লর্ড মিন্টু অনুমোদন করেননি। তবে মুসলমানদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য ছাত্রবৃত্তির হার বাড়ানো হয়, স্কুলে মুসলমান শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানোরও উদ্যোগ নেয়া হয়।

নভেম্বর ১৯১০ ভারত শাসন বিভাগে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ভারত সচিব মর্লেগু পদত্যাগ করেন এবং লর্ড প্রিউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। লর্ড মিন্টুর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বড় লাট হয়ে আসেন। তিনি জানান যে, ডিসেম্বর ১৯১১ ব্রিটিশ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারত সফরে আসবেন। ফলে জনমনে জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। কথা ওঠে ব্রিটিশ সম্রাট ভারতে এসে বঙ্গভঙ্গ রদ করবেন অথবা সীমানা পুনর্নির্ধারণ করবেন। এসব জল্পনা-কল্পনার একটা ভিত্তি ছিল, কিন্তু মুসলমানরা তা বিশ্বাস করেনি। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের মতামত তার কাছে পেশ করতে বললেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা জুন ১৯১১ ভাইসরয়ের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ওই স্মারকলিপিতে গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষর ছিল। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীরা দাবি করেন যে, বঙ্গভঙ্গ বাতিলের মতো প্রশংসনীয় কাজ আর কিছু হবে না। ১৭ জুন ১৯১১ অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য স্যার জন জেঙ্কিংস্ বঙ্গভঙ্গ রহিত করা ও রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করার প্রস্তাব করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ জেঙ্কিংস্-এর প্রস্তাবের সঙ্গে আরো কিছু বিষয় সংযোজিত করেন। যেমন একজন গভর্নরের অধীনে নতুন প্রদেশ হিসেবে

www.pathagar.com

বঙ্গদেশের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যাকে সংযুক্ত করে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে একটি নতুন প্রদেশ গঠন এবং আগের মতো করে আসামকে চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করণ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯ জুলাই ১৯১১ উপর্যুক্ত প্রস্তাবগুলো অনুমোদনের জন্য ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন। ৭ আগস্ট ১৯১১ ভারত সচিব লর্ড প্রিউ এসব প্রস্তাব অনুমোদনের কথা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন। একই বছর ১০ নভেম্বর ব্রিটিশ মন্ত্রী পরিষদ প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করে। সেক্রেটারি অব স্টেট ১ নভেম্বর ১৯১১ এক পত্রে অনুমোদনের কথা জানিয়ে দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ করার পক্ষে ভারত সরকার বেশ কটি কারণের কথা উল্লেখ করেন। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: "বিভিন্ন ঘটনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছে যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে অনুভূতির তিক্ততা ভয়াবহ এবং তা ব্যাপক ও অনমনীয়। সংকটের শেষ প্রান্তে এসে আমরা ঐ ব্যবস্থা অনুসরণ করছি। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সন্দেহাতীতভাবে উপকৃত হয়েছে, আর এ প্রদেশের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা সন্তুষ্ট, তারা সরকারের প্রতি অনুগত। অথচ প্রদেশের বাঙালিরা (অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুরা) এতে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই অধিকাংশ জমির মালিক, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এবং তারা জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী। বেঙ্গল প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে উভয় আইন পরিষদে বাঙালিরা একদিকে বিহারী ও উড়িষ্যা এবং অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও আসামের অধিবাসীদের তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাঙালিরা (অর্থাৎ হিন্দুরা) তাদের সংখ্যা, সম্পদ ও সংস্কৃতি বিবেচনায় যতোটা প্রভাব বিস্তারের অধিকারী ততোটা প্রভাব বিস্তার তারা ঐ দুই প্রদেশে কখনোই করতে পারবে না। এসব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাঙালিরা (অর্থাৎ হিন্দুরা) সত্যিকার অবিচারের অনুভূতির মধ্যে রয়েছে। এবং আমরা মনে করি অনতিবিলম্বে এর নিরসন করাই যথার্থ নীতি। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ; আমাদের পরিকল্পনায় বাংলাভাষী জনগণের এলাকায় বিভক্তিকে সংযুক্ত করা হলেও মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের প্রায় সমান বা সম্ভবত কিছুটা বেশী হবে। আইন পরিষদে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের সুবিধা পাওয়ায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হবে; স্থানীয় সংস্থায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও তারা এখনকার মত অবস্থায় থাকবে।"

সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ দিল্লিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠান হয়। সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ ও কোলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের ঘোষণা করলেন। ঘোষণা অনুযায়ী আসামকে বাদ দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে একীভূত করা হলো। প্রশাসনিকভাবে বাংলা ভাষাভাষীরা এক হলো বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমান আলাদা হয়ে গেল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘোষণা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য ছিল আশাভঙ্গের কারণ। বঙ্গভঙ্গ রদ-উত্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য পূর্ববঙ্গ মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের

www.pathagar.com

অনুরোধে নবাব সলিমুল্লাহ ৩০ ডিসেম্বর ১৯১১ ঢাকায় এক বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে গণ্যমান্য মুসলিম নেতারা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অনুভূতি ও বিশেষভাবে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় মুসলমানরা তাদের গভীর দুঃখ ও ব্যাপক হতাশার কথা ব্যক্ত করছে। মহামান্য সম্রাট নিজেই এই ঘোষণা দেওয়ায় সম্রাটের প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের কারণে মুসলমানদের প্রতিবাদ থেকে দূরে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।" ৩ মার্চ ১৯১২ কোলকাতায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নবাব সলিমুল্লাহ। মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ রদ করার উপর সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়– "মুসলমানদের অনুভূতি ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গভীর হতাশা ও ক্ষোভ ব্যক্ত করছে এবং আশা করছে যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"

২৯ জানুয়ারি ১৯১২ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ তিন দিনের জন্য ঢাকা সফরে আসেন। গভর্নর জেনারেলের সফরকে সামনে রেখে প্রাদেশিক মোহামেডান এসোসিয়েশন, মুসলিম লীগ এবং প্রদেশের অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "গত ৬ বছরে ঢাকা ও সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসামে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা আশা করি, নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনেও অনুরূপ উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত থাকবে"। নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের ১৯ জন প্রতিনিধি ৩১ জানুয়ারি ১৯১২ শাহবাগে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। গভর্নর জেনারেল জানান যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববঙ্গের জন্য একজন বিশেষ শিক্ষা অফিসার নিয়োগের বিষয়ে সরকার সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গভর্নর জেনারেলের এই যুগান্তকারী ঘোষণাটি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি সরকারি ঘোষণা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বিশাল বিতর্কের সৃষ্টি করে। হিন্দু ভদ্রলোকদের কাছে এ রকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা গ্রহণযোগ্য ছিল না। নেতৃস্থানীয় হিন্দু ও ইঙ্গভারতীয় সংবাদপত্র 'The Bengali' এবং 'The Statesman' পত্রিকায় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিন্দা জ্ঞাপন করে। অন্যদিকে মুসলিম অনুভূতির বাহন 'The Comrade' পত্রিকা প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। 'The Comrade'-এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন এর ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের দান প্রবাহ শুকিয়ে যাবে। গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা থেকে কোলকাতায় ফিরলে ড. রাস বিহারী ঘোষের নেতৃত্বে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ একটি প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জি, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আম্বিকা চরণ মজুমদার, কিশোরী

www.pathagar.com

মোহন চৌধুরী, দ্বারকা নাথ চক্রবর্তী, যাত্রামোহন সেন, এবং একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি আবদুর রসুল। আবদুর রসুল পেশায় ছিলেন আইনজীবী এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'। মৌলভী লিয়াকত হোসেনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক। ড. রাস বিহারী ঘোষের নেতৃত্বে যাঁরা গভর্নর জেনারেলকে স্মারক প্রদান করেন তাঁরা তাঁদের স্মারককথার মোড়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছিল, "It is feared that the creation of a separate university at Dacca will be in the nature of an internal partition a break-up of the national life of the people now happily re-united." স্মারকলিপিটির ভাষা ছিল চাতুর্যপূর্ণ। তাদের ভাষায়, বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে জনগণ আনন্দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এ রকম অবস্থায় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে জাতীয় জীবনে অভ্যন্তরীণ ভাগ সৃষ্টি করা। স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়েছিল, যেহেতু পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার করা সম্ভব হবে না। (The deputationists argued that, "the vast majority of Moslems there [Eastern Bengal] were agriculturists on whom the university would hardly confer any appreciable benefit") বলা বাহুল্য যে ভাইসরয়ের কাছে স্মারকলিপি প্রদানকারীরা ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দুষ্ট। সমাজবিজ্ঞানীরা প্রশ্নাতীতভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষার সুযোগ সামাজিক সচলতা (social mobility) এনে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ববঙ্গের পশ্চাদপদ দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের সন্তানের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে একটি সম্ভাবনাময় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।

স্মারকলিপির জবাবে ভাইসরয় বললেন, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্যবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা এই অঞ্চলের জনগণের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আশঙ্কা বিরাজ করছে যে বঙ্গভঙ্গ তাদের প্রতি প্রশাসনিক মনোযোগ আকর্ষণের যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল এখন তার পরিবর্তন তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির জন্য একটি বিপর্যয় হিসেবে দেখা দেবে। ভাইসরয় স্মারকলিপি প্রদানকারীদের আরো আশ্বস্ত করে বলেন যে, মুসলিম প্রতিনিধিদলের কাছে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে সুপারিশ করার কথা বলার অর্থ এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হবে। উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং পাঠদানকারী একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ভাইসরয় আরো বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির চরিত্র হবে অসাম্প্রদায়িক। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দু ভদ্রলোকেরা 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যায়িত করে বিদ্রূপ করা শুরু করেছে। প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বা সম্প্রদায় বিশেষের বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যায়িত করার প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায়

www.pathagar.com

রাখতে ইংরেজ সরকার বদ্ধপরিকর ছিল। এ কথাও সত্য যে ব্যতিক্রমী কিছু বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সমর্থন করেছিল। ভারতীয় কংগ্রেসের সম্মানিত নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল বললেন `a residential and teaching university to affiliate colleges here after was likely to meet objections in Bengal' ....out side Bengal everyone welcomes the university' স্যার আশুতোষ মুখার্জিও প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা পছন্দ করেননি। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে ঢাকা এবং পাটনা ও রেঙ্গুনেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে তিনি স্বীকার করেন যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অতিকায় পরীক্ষা গ্রহণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের স্মৃতির দীপে' উল্লেখ করেছেন কিভাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে তাঁর মত পরিবর্তনে প্রভাবিত করেছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার আশুতোষকে বলেছিলেন, তীব্র সমালোচনা ও প্রচারণা সত্ত্বেও সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। স্যার হারকাউন্ট বাটলারের মতো স্যার আশুতোষ ছিলেন একটি অনিশ্চিত উপাদান। ভাইসরয় স্যার আশুতোষকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর মতের ওপর গুরুত্ব দিতেন। ভাইসরয় স্যার আশুতোষকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা না করার অনুরোধ করেন। ভাইসরয় স্যার আশুতোষের সমর্থনের বিনিময়ে মূল্য প্রদানেও প্রস্তুত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভাইসরয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চারটি প্রফেসরের পদ অনুমোদনে সম্মত হওয়ায় স্যার আশুতোষ বিরোধিতা না করতে সম্মত হন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও স্যার আশুতোষের মধ্যে এই সমঝোতাকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেউ কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ধারণাকে তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। আব্দুর রসুলের মতো জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা এবং মৌলভী লিয়াকত হোসেনের মতো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্টুয়ার্ট বেইলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করেছিলেন। তাঁর মতে, মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের জন্য একটি নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে গভীরভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিল। অপরদিকে এর বিরোধিতায় হিন্দুরা সাধারণভাবে বিরোধী ছিল, যদিও তাদের মধ্যে ভিন্নমতও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই বিরোধীরা ছিল অসন্তুষ্ট বিক্ষোভকারী বাঙালি।

সমালোচনা, বিরোধিতা ও বৈরী প্রচারণা সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার প্রবল প্রত্যয় ও উৎসাহের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক চাপ এবং তা থেকে উদ্ভূত নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তহীনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছ থেকে সম্মতি পাওয়ার পর প্রকল্পটি চালু করা হয়। ৪ এপ্রিল ১৯১২ ভারত সরকার বাংলা সরকারকে এক চিঠিতে প্রকল্পের নীতিগুলো মোটা দাগে অবহিত করে এবং আর্থিক দায়ভারসহ একটি পরিপূর্ণ প্রকল্প পেশের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। বাংলা সরকার ভারত সরকারের নির্দেশের আলোকে ২৭ মে ১৯১২ এই লক্ষ্যে ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্য সদস্যরা

www.pathagar.com

ছিলেন ড. রাস বিহারী ঘোষ, প্লিডার বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্লিডার সতীশ চন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ বাবু ললিত মোহন চ্যাটার্জি, খান বাহাদুর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, আলীগড় মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের সদস্য ও ট্রাস্টি মোহাম্মদ আলী, এবং ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল উলামা আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহিদ। নাথান কমিটির রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ের শেষ প্যারাগ্রাফে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কমিটির ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয়, 'A University... must denote more than mere examination, must undertake more than mere control, must offer more than mere instruction. It must be an institution in which a true education can be obtained, the training of the mind, body and character, the result `not a book, but a man', নাথান কমিটির রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ঔৎসুক্য ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। রিপোর্টের ওপর জনমত আহ্বান করা হলে অনেক অভিমত ও পরামর্শ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে একটি পাঠদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হলেও বিস্তারিত খুঁটিনাটির প্রশ্নে অনেক বিরূপ মন্তব্য আসে। এইসব মন্তব্য সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থেরই প্রতিধ্বনি করে। বাংলা সরকারের একটি বক্তব্য এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়, "the great majority of the documents being Hindu in origin and feeling, they fail to show a due appreciation of the needs and sentiments of other section of the population, and especially of the Muhammadan community. There appears indeed to be some apprehension lest the establishment of a university at Dacca, affording opportunities to Muhammadan and other special classes such as they have not hither to enjoyed, may threaten the intellectual supremacy which the Hindu middle class of Bengal has so long held, and this apprehension has consciously or unconsciously narrowed the views of some who might otherwise have given more independent and useful advice'. যারা মন্তব্য পাঠিয়েছিল তাদের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু। তারা সমাজ ও জনগোষ্ঠীর অন্যান্য অংশবিশেষ করে মুসলমানদের চাহিদা ও অনুভূতির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে পারেনি। তারা ভেবেছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ও অন্যান্য বিশেষ সম্প্রদায় সুবিধা ভোগ করবে যা তারা অতীতে ভোগ করেনি। এর ফলে দীর্ঘকাল ধরে বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য ভোগ করে আসছে তার অবসান ঘটবে। এই মানসিকতাই তাদের অভিমতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নাথান কমিটির সুপারিশ এবং জনমতের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটির কিছু সংশোধন করে ভারত সরকার প্রতিবেদনটি সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে পেশ করে। আগস্ট ১৯১৪ প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে সরকারকে ব্যয় সংকোচন করতে হয় এবং এক বারে পুরো প্রকল্প বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সরকারের আমলাতন্ত্র পুরো

www.pathagar.com

রিপোর্টটিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে পায় এর বেশ কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। নাথান কমিটি বলেনি বিশ্ববিদ্যালয়টি আসলে কেমন হবে এবং কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটি গড়ে উঠবে। সরকারি অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে তারও কোনো নির্দেশনা রিপোর্টে ছিল না। শিক্ষকরা সরকারের কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা তোলা সত্ত্বেও কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে মনিব জ্ঞান করবে তারও কোনো ইঙ্গিত ছিল না রিপোর্টে।

এরপর পুরো বিষয়টি নিয়ে বাংলা সরকার, ভারত সরকার ও সেক্রেটারি অব স্টেটের মধ্যে চিঠিপত্র ও নোটের মাধ্যমে মতামত ও চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান চলতে থাকে। অক্টোবর ৭ থেকে ১২, ১৯১৪ সরকারের সিভিল সার্ভিসের কিছু বরিষ্ঠ আমলা হারকুট বাটলার ও এইচ সার্পের সঙ্গে সিমলায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়। তাঁরা ডব্লিউ এ টি আর্চবোল্ট প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় বিলের খসড়া পর্যালোচনা করেন। প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগত দিকটি ও মর্যাদার বিষয়টি বিবেচিত হয়। এসব বিষয় ভারত সরকারের আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভাগের কাছে প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা হোক, ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর ১৯১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের মনস্থ করেন। এই প্রচেষ্টা শেষ মুহূর্তে বিষয়টি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে পেশের সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প একের পর এক পরিবর্তিত ও সংশোধিত হচ্ছিল। পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে ফেলে দেয়। মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকারের আন্তরিকতায় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে ১৯১৫ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। অন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ সরকারের কালক্ষেপণের জন্য অসন্তোষ ব্যক্ত করে সরকারকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে রাজি করানোর চেষ্টা করে। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এই প্রয়াসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত লেগে থাকেন। অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হলেও বিষয়টি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষায় বিলম্বিত হতে থাকে। মুসলমানরা অস্থির হয়ে ওঠে। মুসলমানদের এই অনুভূতি প্রতিধ্বনিত হয় 'ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'– এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বিল পেশের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বললেন, 'From the very beginning a strange Nemesis had dogged this question... The people of Eastern Bengal strongly feel that they have been sacrificed to the clever maneuvers of certain sections of the Calcutta University, Calcutta Press.' সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভাষণের জবাবে এডুকেশন মেম্বার স্যার সংকরণ নায়ার জানালেন সরকার সুনিশ্চিতভাবে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটির খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকলেও এটি প্রতিষ্ঠার মৌলিক প্রশ্নে কোনো দোদুল্যমানতা নেই। তিনি আরো জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল ইতোমধ্যেই খসড়া করা হয়েছে, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে সরকার বিল পেশের ব্যাপারটি বিলম্বিত করছে।

www.pathagar.com

১৯১৭ সালে নিযুক্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম. ই স্যাডলার। এই কমিশনের সদস্যরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু তারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পুনর্গঠনের প্রশ্নে নিবেদিত, সেহেতু তারা সরকার প্রতিশ্রুত না হলেও ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করতেন এবং তা স্থাপিত হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে অথবা যত শীঘ্র সম্ভব। কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যার ভারে এতটাই জর্জরিত যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিষয়টি দেখভাল করা সম্ভব নয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনকে একটি বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়। প্রশ্ন উঠল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি একটি একক পাঠদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে না পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো (১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) যুগপৎ পাঠদানকারী ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হবে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় বিকল্পের পক্ষাবলম্বনকারী। তাদের দাবি ছিল পূর্ববঙ্গের কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন অধিকাংশ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদনকারীর ক্ষমতা প্রদানের বিপক্ষে দাঁড়ায়। তাদের আশঙ্কা ছিল এর ফলে এই অঞ্চলের কলেজগুলোর ওপর মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জন্য ১৩টি সুপারিশ পেশ করল। এসব সুপারিশ এবং ১৯১২ সালের সংশোধিত প্রকল্পের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রণীত হয় এবং বিলটি ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ পেশ করা হয়। বিলটি আইন আকারে পাস হয় ২৩ মার্চ ১৯২০। এই আইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পাঠদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠার কথা বলে। বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তার বাস্তবায়নের জন্য ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। এই দীর্ঘ ১০ বছরে হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রাণপণ প্রয়াস ছিল এটির প্রতিষ্ঠার পথে কত অজুহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায়। বাংলার এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা যে কত দুরূহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কণ্টকাকীর্ণ ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। একটি দেশে একটি অগ্রসর সম্প্রদায় অন্য একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অগ্রগতির প্রতি হিংসাবিদ্বিষ্ট হলে সে দেশ সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতার পথেই এগোবে তাতে সন্দেহ কী থাকতে পারে?

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও তৎপরবর্তী রাজনীতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরোধিতা ছিল এক ধরনের স্বার্থপর মানসিকতার প্রতিফলন। তারা মনে করত উচ্চশিক্ষা তাদের একচেটিয়া অধিকার। তাদের তুলনায় অনগ্রসর সামাজিক গোষ্ঠীগুলো উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে খর্ব করবে সেটা কোনোক্রমেই তাদের কাছে কাম্য ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে হিন্দু ভূ-স্বামীরা ছিল সমাজ কাঠামোর উপরিস্তরে। জমিদারি খাজনার আয় তাদের সামাজিক কর্তৃত্বকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল শুধু জমির খাজনার ওপর নির্ভর করে তারা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে পারছে না। তাই প্রয়োজন ছিল ভিন্ন

www.pathagar.com

উপায়ে সামাজিক ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা। সামাজিক ক্ষমতার এই বাহনটি হলো শিক্ষা। হিন্দু ভদ্রলোকরা পরিণত হলো শিক্ষিত সম্প্রদায়ে। তারা পরিচিত হলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিসেবে। বাংলার সমাজে এই পরিবর্তনটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন। ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীর জায়গায় গড়ে উঠতে থাকল সংস্কৃতিভিত্তিক অভিজাত সম্প্রদায়। হিন্দু ভদ্রলোকরা এখন আর ভূমিনির্ভর অভিজাত শ্রেণী নয়। এরা এখন সংস্কৃতিবান এক আলোকিত শ্রেণী। বাংলার রেনেসাঁর উত্তরাধিকার এখন তাদের হাতে। আধুনিকতা ও প্রগতির ধ্বজাধারী তারা। সামাজিকভাবে রূপান্তরিত এই শ্রেণীটি ভাবতে শুরু করল জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব প্রদানের মৌরসিপাট্টাটা তাদের হাতে। এই মানসিকতা থেকে তারা ভাবতে শুরু করল বঙ্গদেশে তাদের আধিপত্য থাকবে সব ধরনের চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে। এই মানসিকতাই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী হিন্দু ভদ্রলোকদের ব্রিটিশ শাসনের অবসানে বাংলা ভাগের পক্ষে অনড় অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়। তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি পরিণত হয় সাম্প্রদায়িক কায়েমি স্বার্থের রাজনীতিতে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে স্থান করে নেয় সাম্প্রদায়িক প্রতীক ও আদর্শ। জাতিকে দেবী কালীর সমতুল্য ঘোষণা, ঘটা করে কালী পূজা ও শিবাজি উৎসব উদযাপন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে শাক্ত দর্শনের প্রাধান্য প্রভৃতির মাধ্যমে ভারত ও হিন্দুত্ব একাকার হয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে নিদ্রাচ্ছন্ন হিন্দু জাতির পুনরুত্থান ঘটল। ব্রিটিশ বিরোধিতা কার্যত রূপান্তরিত হলো মুসলিম বিরোধিতায়।

১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাংলা প্রদেশে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এই প্রদেশে মুসলমানদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে মুসলমানরা ছিল সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতীয়দের ক্ষমতার যে চাবিকাঠিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিয়েছিল, তার ওপর বাংলার সমাজে হিন্দু ভদ্রলোকরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে প্রাদেশিক আইন সভায় হিন্দু সদস্যের সংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়েও কমে গেল। এর ফলে বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় হিন্দু সদস্যরা পরিণত হলো সরব সংখ্যালঘিষ্ঠে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর হওয়ার পর ভদ্রলোকদের চিরতরে মুসলমানদের অধীনস্থ অবস্থানে ফেলে দিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের অব্যবহিত পর পুনা চুক্তির ফলে প্রাদেশিক পরিষদে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আরো সংখ্যালঘু হয়ে পড়ল। অথচ তাদের আশা ছিল আইন সভায় তারাই প্রাধান্য বহাল রাখবে।

১৯২৯-এর মহামন্দা হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রাধান্য বহাল রাখার আকাঙ্ক্ষাকে তছনছ করে দেয়। মন্দার ফলে শস্যের দাম কমে যায় এবং কৃষকদের ঋণদানের যে মহাজনী ব্যবসা চালু ছিল, তা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিন্দু ভদ্রলোকরা দেখতে পেল খাজনা ও সুদের ওপর নির্ভরশীল তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অপরদিকে মহামন্দার ফলে চাষিরা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে এল। চাষি প্রজাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। চাষি প্রজারা গ্রামবাংলায় সামাজিক ভাঙনের এই পরিস্থিতিতে তাদের ভূ-স্বামীদের কর্তৃত্বকে খর্ব করা এবং নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়াস পেল। ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইন অনুযায়ী সচ্ছল কৃষকরা ভোটাধিকার পেল এবং প্রথমবারের মতো আইন সভায় তাদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত

www.pathagar.com

হলো। কৃষক প্রজাদের সমর্থনে এগিয়ে এল মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা। মুসলমানদের শিক্ষা ও চাকরি-বাকরির প্রতি বাংলা সরকারের সহায়ক নীতির ফলে মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানও কম ছিল না। হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বেশ অসন্তোষ ছিল। উদীয়মান মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও মুসলিম কৃষক প্রজাদের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের বন্ধন সৃষ্টি হলো। বাংলার রাজনীতিতে পালাবদলের সূচনা ঘটল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ, ১৯২৯-এর মহানন্দা, ভূমিনির্ভর হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংকট এবং মুসলিম কৃষক প্রজার নবলব্ধ ক্ষমতা– এ সবকিছু একে অপরকে শক্তি জোগাল এবং বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করল।

১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষিত হয়। ব্রিটিশ শাসকদের এই পর্যায়ে লক্ষ্য ছিল এমন এক ধরনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করা, যার ফলে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রশাসনিক চাপ হ্রাস পায় এবং ব্রিটিশ শাসক ও দেশীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। নতুন এই ব্যবস্থানুযায়ী প্রদেশগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়। বাংলা প্রদেশে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাদেশিক পরিষদে আসন বণ্টন ছিল নিম্নরূপ :

নির্বাচনী এলাকা	সদস্য সংখ্যা
মুসলমান	১১৭
মুসলমান নারী	০২
সাধারণ	৭০
নিম্ন শ্রেণী	১০
সাধারণ নারী	০২
ইউরোপীয়	১১
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী	১৪
ভারতীয় ব্যবসায়ী	০৫
ভূ-স্বামী	০৫
বিশ্ববিদ্যালয়	০২
শ্রমজীবী	০৮
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	০৩
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী	০১

সাম্প্রাদায়িক রোয়েদাদ অনুসারে বাংলা প্রদেশের আইন সভার ২৫০ আসনের মধ্যে ২৫ আসন অর্থাৎ মোট আসনের ১০ শতাংশ পেল ইউরোপীয়রা। অথচ এই প্রদেশে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক-শতাংশেরও কম। এই রোয়েদাদে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো। মুসলমানরা মুসলমানদের, হিন্দুরা হিন্দুদের এবং ইউরোপীয়রা ইউরোপীয়দের নির্বাচিত করল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সবচেয়ে

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আসন বণ্টন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুসহ হিন্দুদের জন্য আশিটি আসন অর্থাৎ মোট আসনের বত্রিশ শতাংশ নির্ধারণ করা হলো। ১৯৩১'র আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলায় হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাতে আইন সভায় হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব কমে গেল। অন্যদিকে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানরাও আইন সভায় যথাযথ সংখ্যক আসন পেল না। ২ কোটি ৭৮ লাখ মুসলমান ছিল বাংলা প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ। বাংলার মুসলমানরা ছিল সেই সময়কার উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। অথচ রোয়েদাদ অনুযায়ী মুসলমানরা পেল ১১৯টি আসন, মোট আসনের ৪৭.৮ শতাংশ। রোয়েদাদের ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই জনসংখ্যার অনুপাতে আসন পায়নি, কিন্তু আইন সভায় মুসলমানদের আসন সংখ্যা হিন্দু আসনের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে গেল। দ্বৈত শাসনের সময় বেঙ্গল কাউন্সিলে হিন্দু আসনের সংখ্যা ছিল ৪৬টি এবং মুসলিম আসনের সংখ্যা ছিল ৩৯। এ কারণে তখন বাংলার রাজনীতি ও সমাজে হিন্দু ভদ্রলোকদের আধিপত্য শক্ত অবস্থানে ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মাধ্যমে কলমের এক আঁচড়ে পুরো পরিস্থিতি পাল্টে গেল। হিন্দুদের ৮০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পেল ৭০টি আসন অর্থাৎ মোট আসনের ২৮ শতাংশ। প্রথমবারের মতো বাংলার আইন সভায় মুসলমানরা একটি শক্তিশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মাধ্যমে খেলাফত হারানোর বেদনায় ক্ষুব্ধ মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ শাসকরা। বাংলার গভর্নর জন এন্ডারসন বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আরো ভারসাম্যমূলকভাবে আসন বণ্টনের আবেদন জানালেন ভাইসরয়ের প্রতি। কিন্তু ভাইসরয় উইলিংডন কেবল বাংলা প্রদেশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন না। কারণ এতে করে কেবল বাংলার মুসলমানরাই নয়, সমগ্র ভারতের মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়তে পারে। কিছু ইতস্তত করে ইন্ডিয়া অফিসও শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের মতের প্রতি সায় দিল। বাংলার গভর্নর জেটল্যান্ড, যিনি সর্বসম্প্রতি গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে জেটল্যান্ড তাঁর মতামত নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেন।

১. এই রোয়েদাদ একটি অগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধীনস্থ করে ফেলবে।
২. এর ফলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা চরমভাবে বৃদ্ধি পাবে।
৩. এর ফলে একটি অন্যায় বোধের সৃষ্টি হবে যা খুব সহজে প্রমার্জিত বা বিস্মৃত হবে না।
৪. এর ফলে বিক্ষোভ আন্দোলন বেড়ে যাবে এবং রাষ্ট্রদ্রোহী আন্দোলনকে উস্কে দেবে।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদ করে শীর্ষস্থানীয় হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বাংলার গভর্নর জেটল্যান্ডের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এশিয়াটিক

www.pathagar.com

সোসাইটির সভাপতি দার্শনিক বজেন্দ্রনাথ শীল, প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী ড. পি. সি. রায় এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। স্মারকলিপিতে তাঁরা বলেন, "the enormously predominant part [the Hindus of Bengal].... have played under the British in the intellectual, the cultural, the political, the professional, and the commercial life of the province... The Hindus of Bengal, though numerically a minority, are over whelmingly superior culturally, constituting as much as 64 percent of the literate population... while their economic preponderance is equally manifest in the spheres of the independent profession". বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু সভার নামে প্রচারিত আর একটি প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল, "The superiority of the Hindu community in educational qualification and political fitness, their contribution to the growth of civic and political instituton and their record of past services to the state in every branch of administration are too well known to need recapitulation. The achievement of the Hindu Bengalis stand foremost in the whole of India in the fields of Art, Literature and Science, whereas the Moslem community in Bengal has not so far produced a single name of All- India fame in these fields". হিন্দু ভদ্রলোকদের মতে, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদটি ছিল সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক হামলা। উপর্যুক্ত বক্তব্য দুটির মতো আবেগমণ্ডিত ভাষা এবং রূপকল্প ব্যবহার করে শত শত বিজ্ঞাপন, দরখাস্ত ও বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে একটি সুষম এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্ত গোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরা হয়, কিন্তু এখন এই গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার প্রয়াস চলছে। এইসব প্রচারণার মূল কথা ছিল একটি মহান সম্প্রদায়কে চিরতরে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে হীনতর একটি সম্প্রদায়ের দাসে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। এরা হলো 'বাংলার নিন্দিত মুসলিম সম্প্রদায়'। যে সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে সেই সংস্কৃতি হলো বাংলার ভদ্রলোকদের সংস্কৃতি। এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সাঁওতাল, বাউরি ও বাগদিদের মতো প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে কদাচ স্পর্শ করত না। এ ছাড়া নমশূদ্র, রাজবংশী, মহিষ্য, সাহা, সদগোপ ও কৈবর্তদের মতো হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও এই ভদ্রলোক সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং একটি সুষম হিন্দু বাংলার অস্তিত্ব কখনোই ছিল না। হিন্দু ভদ্রলোকদের যুক্তি ছিল মুসলমানদের চেয়ে জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘু হলেও কীবা যায় আসে! শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনে তারা অনেক বেশি অগ্রসর। সুতরাং আইন সভায় তাদের আসন সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে কম হবে কোন যুক্তিতে? সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় জাত্যাভিমানের এর চেয়ে উদ্ধত বহিঃপ্রকাশ আর কী হতে পারে?

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রশ্নে হিন্দু নেতৃত্বের তুলনায় মুসলমান রাজনীতিকদের অবস্থান অনেকটাই অস্পষ্ট ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর অনেক মুসলমান কংগ্রেস

www.pathagar.com

ত্যাগ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর ফলে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট, যেটি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত ছিল, ভেঙে যায়। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন এই প্যাক্টের মূল উদ্যোক্তা। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে এটি ছিল একটি আপস ফর্মুলা। প্যাক্ট অনুযায়ী পৃথক নির্বাচন এবং প্রত্যেক জেলার স্থানীয় সংস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ৬০ শতাংশ আসন প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে মুসলমানদের বাংলার ১৬টি জেলার স্থানীয় সরকারে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ লাভের অবস্থা সৃষ্টি হলো। কারণ, এসব জেলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুরা নিয়ন্ত্রণ পেল পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় বাংলার মাত্র নয়টি জেলায়। ১৯২৩ সালে সম্পাদিত এই চুক্তিটির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হিন্দুদের বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে এই চুক্তি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দুর্বল হয়ে যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চুক্তিটিরও মৃত্যু ঘটে।

ব্রিটিশরাজ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করলে বাংলার রাজনীতি সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে আরো তীব্রভাবে বিভক্ত হতে শুরু করে। বাংলায় হিন্দুরা ছিল একটি বৃহৎ ও সরব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে অর্জিত ক্ষমতা প্রয়োগে এই সম্প্রদায়টি পরিণত হয় কনিষ্ঠ অংশীদারে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলফুলের দিনে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক প্রজা-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ৫২ জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেস ছিল নবগঠিত আইন পরিষদে একক বৃহত্তম দল। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ফজলুল হক চেয়েছিলেন কংগ্রেস হবে ক্ষমতায় তার অংশীদার। নির্বাচনে কৃষক প্রজা ও কংগ্রেস অনানুষ্ঠানিক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই মিত্রতার ফলে কংগ্রেস কোনো মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং এসব আসনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রতি কংগ্রেস মৌন সমর্থন দিয়েছিল। নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে কৃষক প্রজা পার্টি রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়ায় কংগ্রেস এই প্রতিশ্রুতিকে তাদের প্রতি সহানুভূতি হিসেবে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে কোয়ালিশন সরকারের এজেন্ডার প্রশ্নে একমত হতে না পারায় কংগ্রেস ও কৃষক প্রজার সমঝোতা ভেঙে যায়। কংগ্রেস নেতারা বিশেষ করে শরৎ বসু, বিধান চন্দ্র রায় এবং কিরণ শংকর রায় রাজবন্দীর মুক্তির প্রশ্নটিকে মন্ত্রিসভার এক নম্বর অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করার দাবি জানান। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, এই প্রশ্নে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যদিকে কৃষক প্রজার নেতারা মনে করলেন কৃষকের কল্যাণই তাদের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। তারা আরো বললেন, রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে পদত্যাগ করলে কৃষক কল্যাণের প্রশ্নটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসীন হওয়া তো দূরের কথা কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্তও হতে চাইল না। ফজলুল হক বাধ্য হলেন মুসলিম লীগের সমর্থন গ্রহণ করতে।

বাংলার মুসলিম মন্ত্রিসভা, প্রথমে লীগপ্রজা কোয়ালিশন এবং পরবর্তীকালে এককভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আইন সভার মাধ্যমে এমন কতকগুলো সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে যার ফলে মুসলিম স্বার্থ উপকৃত হয় এবং ভদ্রলোকদের সুবিধা খর্ব হয়। বিরোধী কংগ্রেস আইন সভার মাধ্যমে হিন্দু কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে যে আঘাত পরিচালিত হয়

www.pathagar.com

সেটা মোকাবেলায় অসহায় বোধ করে। ১৯৩৭ এ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভায় ব্যাপক সংখ্যক গ্রামীণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এদের অনেকেই ছিল জমিদার ও তালুকদার। কিন্তু এরা ছিল এক নবপ্রজন্মের রাজনীতিক। মফস্বল এলাকায় জন্মলাভ ও লালনপালনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠা এই রাজনীতিকদের দন্তোদ্গম হয়েছিল ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদের রাজনীতিতে। এই নবপ্রজন্মের রাজনীতিকদের আর একটি অংশের অভ্যুদয় ঘটেছিল কৃষক সমিতির নেতা হিসেবে। এরা কৃষক ও জোতদারদের স্বার্থের কথা বলতেন। এদেরই স্বঘোষিত নেতা বাধ্য ছিলেন প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিল আইন সভায় পেশ করতে। ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিল আইন সভায় পেশ করা হলো। বিলে প্রস্তাব করা হয় জমি হস্তান্তরের জন্য জমিদার সালামি গ্রহণ করতে পারবে না এবং জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জমিদারের Right of pre-emption থাকবে না। এর ফলে প্রজারা স্বাধীনভাবে জমি জমা ভাগ-জোক ও হস্তান্ত রের সুযোগ পাবে। বস্তুত এই বিলের মাধ্যমে জমিদারদের প্রজা নির্বাচনের সুযোগ বাতিল এবং বড় প্রজারা তাদের তালুকে জমিন একত্রীকরণের সুযোগ লাভ করে। এই বিলে সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে জমিদারের বকেয়া খাজনা আদায় এবং বকেয়ার ওপর সুদ আদায় ও ১০ বছর পর্যন্ত খাজনা বৃদ্ধির সিলিং নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে জমিদারের খাজনা আদায়ের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। এর ফলে মফস্বল অঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতা প্রয়োগ ও ধর্নাঢ্য হওয়ার সুযোগ খর্ব হয় এবং ধনী কৃষকদের হাত শক্তিশালী হয়। যেহেতু জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সেহেতু গ্রামাঞ্চলে হিন্দু আধিপত্য খর্ব হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। হিন্দু জমিদাররা বিলটিকে একটি সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ হিসেবে নিন্দা জানায়। অথচ এই বিলটি ছিল চরিত্রের দিক থেকে বিপ্লবী।

১৯৩৯ সালে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সরকারি বাজার এবং বেসরকারি বাজারের জন্য লাইসেন্সিং প্রথা চালুর বিষয় মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়। এ সংক্রান্ত একটি বিলও তৈরি করার বিষয় আলোচিত হয়। এই পদক্ষেপের প্রতি মুসলমানদের দৃঢ় সমর্থন ছিল। কিন্তু হিন্দু জমিদার মন্ত্রীরা এই বিলের মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানাধীন বাজারগুলো মুসলিম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সূক্ষ্ম কৌশল দেখতে পেল। কারণ, বেশিরভাগ বাজারের মালিক ছিল হিন্দু জমিদাররা। মন্ত্রিসভায় ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে তিন হাজার গ্রামে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ঋণ সালিশি বোর্ড ছিল ঋণের দায় ফয়সালা করার জন্য মহাজন ও খাতকদের একটি ফোরাম। বস্তুত এই সালিশি বোর্ডের ফলে খাতকরা মহাজনের কাছে দায় এড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় মহাজনী আইন মহাজনী ব্যবসায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে এবং সুদের হার সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ নির্ধারণ করে। মহাজনী ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ছিল পেশাদার হিন্দু মহাজন, বেনিয়া, দোকানদার ও ভূমি মালিকদের হাতে। এদের জন্য সুদখোরি ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। আইনটি তাদের ওপর কঠোর আঘাত হানে। এ কথা অবশ্য সত্য যে এই সব পদক্ষেপ মুসলমান জমিদারদের স্বার্থকেও ক্ষুণ্ন করে। ঢাকার নওয়াব পরিবারের ১১

www.pathagar.com

জন আইনসভার সদস্য মুসলমান জমিদারদের স্বার্থের প্রতিভূ ছিল। খাজা নাজিম উদ্দিন ও তার জমিদার সহকর্মীরা আইনের ধার ভোঁতা করে দেয়ার তৎপরতা চালায়। তারা কিছুটা সফলও হয়। কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা জমিদার বিরোধী আইন প্রণয়ন প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য তারা এই ক্ষতি মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। ঢাকার নওয়াবসহ মুসলমান এলিটরা মনে করল তাদের এই অর্থনৈতিক ক্ষতি ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে যথার্থভাবেই পুষিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। তারা দেখল, জমিদারির ক্ষতি ক্ষমতা না থাকার ফলে অন্য কোনোভাবে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

হিন্দু ভদ্রলোকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন শুধু গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই থেমে থাকল না। মুসলিম কোয়ালিশন সরকার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে শুরু করল। ১৯৩৮ সনে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা পুলিশে লোক নিয়োগের নিয়মকানুন পরিবর্তন করে ফেলল। পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টদের নির্দেশ দেয়া হলো কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ কনস্টেবল অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। একই বছরে আরো নির্দেশ দেয়া হলো যে, সরকারি নিয়োগের ৬০ শতাংশ মুসলমান হতে হবে। ১৯৩৯ সালে সরকার স্থানীয় সরকারগুলোকে তাদের কাজে এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগদানের প্রস্তাব করতে বারণ করল যারা সরকারি নীতির বিরোধিতা করবে। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহে মনোনয়নের ব্যাপারেও সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হলো। কোলকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধনী ১৯৩৯ কোলকাতা করপোরেশনের ওপর হিন্দু ভদ্রলোকদের ঐতিহ্যগত প্রাধান্যের অবসান ঘটায়। ১৯৪০-এর মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের ফলে উচ্চতর শিক্ষার ওপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ রহিত করে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে মুসলমানদের অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়। উচ্চশিক্ষা ছিল হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভিত্তি। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষা তাদের পরিচয়ের প্রতীকও ছিল। ভদ্রলোকরা সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতার অধিকারী এই অজুহাত তুলে তারা যে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের দর্শন খাড়া করতে চেয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তার ওপর কঠোর আঘাত হানে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলায় কংগ্রেসের রাজনীতি সঙ্কটের মুখে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে হিন্দু ভদ্রলোকরা সফল হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এমন একটি রাজনৈতিক ডিনামিক্সের সৃষ্টি করে যার অভিঘাতে ভদ্রলোকদের আধিপত্য ভয়ানক সঙ্কটের মুখে পড়ে।

দৃশ্যত বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ শাসিত একটি প্রদেশের প্রশাসনিক বিভাজন হলেও এই বিভাজনকে হিন্দু ভদ্রলোক গোষ্ঠী ও মুসলিম সম্প্রদায় নিজ নিজ সম্প্রদায়গত স্বার্থের আলোকেই বিচার করেছিল। কোলকাতার হিন্দু ভদ্রলোকদের ক্ষমতার পীঠভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রশাসনিক প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে নিজস্ব বিকাশের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। বৃহৎ বাংলা প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ছিল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত। পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে বঙ্গভঙ্গের ফলে পৃথক প্রদেশ গঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলের অনগ্রসর মুসলিম সমাজ সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। শিক্ষার সুযোগ

www.pathagar.com

না পেলে পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে অসম্ভব এই চেতনা মুসলমানদের মধ্যে বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে দৃঢ়মূল হচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই চেতনা প্রখর ছিল না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষায় অগ্রগতি বলতে আমরা বুঝব পাশ্চাত্য ধাঁচের ইংরেজি শিক্ষা। মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন পিছিয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে নানামুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। ১৮৫২-৫৩ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পেপার্স থেকে জানা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর মুসলমানরা প্রবলভাবে সন্দিগ্ধ ছিল। তারা মনে করত পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর একটি মারাত্মক হুমকি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা হচ্ছে তাদেরকে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার পথে একটি পদক্ষেপ। ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মতে, মুসলমানরা তাদের অতীত গৌরবের মধ্যে নিমগ্ন ছিল। উদারনৈতিক শিক্ষার চেয়ে ইসলামি মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করার ওপর তারা অনেক বেশি গুরুত্ব দিত। অপরদিকে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (১৮৭২) ও এ আর মল্লিকের (১৯৬১) ব্যাখ্যা অনুসারে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে ফেলে এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়ক হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলার তৎকালীন রাজধানী কোলকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রধানত প্রজাকুল দ্বারা গঠিত মুসলিম সম্প্রদায়ের লক্ষ্যে কোলকাতার ব্যয়বহুল নাগরিক পরিমণ্ডলে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ ছিল সুদূর পরাহত। ১৮৯১ সালের আদমশুমারির বয়ান থেকে নিম্নবাংলার ইংরেজি শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বণ্টন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। এসব পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর ছিল এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায় ছিল অনগ্রসর। পশ্চিমবঙ্গ ছিল হিন্দু প্রধান এবং পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু তাদের শিক্ষাগত অর্জন এবং ইংরেজি শিক্ষার হার ছিল বেশি। নিম্নের সারণি থেকে এসব চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ইংরেজি শিক্ষায় সমগ্র বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনামূলক অবস্থান ১৮৯১

	মুসলমান			হিন্দু		
আঞ্চলিক বিভাজন	শিক্ষারত ও শিক্ষিত	ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন	মোট অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নদের মধ্যে ইংরেজি জানার শতকরা হার	শিক্ষারত ও শিক্ষিত	ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন	মোট অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নদের মধ্যে ইংরেজি জানার শতকরা হার
বাংলার মূল ভূখণ্ড	৬,৭৮,৬৯৮	১০,২১১	১.৫০	১৫,৮৭,৯৬৪	৬৯,৯৯৬	৪.৪০
উত্তর বাংলা	১,৭২,৮৬৮	১,২০৯	০.৬৯	১,৩৬,৭৪৭	৪,৬৫০	৩.৪০
পূর্ববাংলা	৩,৫৬,৫৭৫	৩,৩১৩	০.৯২	৫,৬৫,৫০৬	১৭,৪৩৪	৩.০৮
পশ্চিম বাংলা	১,৪৬,১৫৫	৫,৬৮৯	৩.৮৯	৮,৮৫,৭১১	৪৭,৯১২	৫.৪০

সূত্র : সেন্সাস অব বেঙ্গল ১৮৯১

www.pathagar.com

সম্প্রদায় ও বর্ণের ভিত্তিতে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক বিভাজন সম্পর্কে পরিসংখ্যান খুবই অপ্রতুল। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে পরিচালিত কিছু কিছু গ্রাম সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বর্ণ ও ধর্মভিত্তিক সামাজিক অবস্থানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হাশিম আমীর আলী বীরভূম জেলার ৭৪৭টি গ্রামীণ পরিবারের ওপর জরিপ করে মন্তব্য করেছেন "as soon as we saw what caste a particular family belonged to and noted whether that caste was among the high, middle or low castes of Hindu society or whether he is a Mussalman or Santal, we could with a fair degree of certainty, indicate in what economic station his family was likely to fall... The economic level of the high castes was higher than of the middle castes. Third in order followed the Mussalmans ... while the low castes such as Hadis, Domes, Muchies were far below with only Santals occupying a still lower economic place". হাশীম আমীর আলীর এই সমীক্ষাটি Modern Review'র জুলাই-ডিসেম্বর (১৯৩৪) সাল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমীক্ষার ফলাফল সারণি আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

গ্রামবাংলায় অর্থনৈতিক বিভাজনের চিত্র

	উচ্চবর্ণ	নবসাক*	মুসলমান	হরিজন	সাঁওতাল
অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন (%)	৫০	৩৩	১৮	৪	৩
ভূমিহীন পরিবার (%)	১৮	১৩	২৫	৮৭	৯২
গড় সম্পদ (রুপি)	২৮২৩	১৫২৮	১০৮৩	৭৩	৭৬
জমির গড় মূল্য (রুপি)	২২২০	১৩৪০	১০৯৮	৩৮	৩৯
গড় বার্ষিক আয় (রুপি)	৪৩৬	২৩৬	১৭২	৮৪	৭৬

* নবসাকরা একটি মধ্যবর্তী বর্ণ। এদের মধ্যে ৯টি উপবিভাজন আছে। এদের কাছ থেকে জলপান করলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জাত নষ্ট হয় না।

সূত্র : Summary Table for Village Economic Surveys in Hashim Ali, Modern Review, July-Dec 1934

উপর্যুক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অক্ষর জ্ঞানের দিক থেকে মুসলমানরা উচ্চবর্ণ ও নবসাক বর্ণের হিন্দুদের তুলনায় অনেক অনগ্রসর ছিল। আবার মুসলমানদের তুলনায় হরিজন ও সাঁওতালদের মতো নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীরা অনেক অনগ্রসর ছিল। ভূমিহীনতায় উচ্চবর্ণ ও নবসাকদের তুলনায় মুসলমানরা শোচনীয় অবস্থায় ছিল। এ ক্ষেত্রে হরিজন ও সাঁওতালদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। গড় সম্পদ মালিকানা, জমির গড়মূল্য এবং গড় বার্ষিক আয়ের দিক থেকেও একই ধরনের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজন লক্ষ করা যায়। বলাবাহুল্য যে সমাজ নির্ধারিত মর্যাদার স্তরভেদের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্তরভেদের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে দেয়া গেলে সামাজিক স্তরভেদের যে পরিবর্তন অনিবার্য– এই বিশ্বাসই বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার রাজনীতির গতিধারাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ

মুসলমানরাই ১৯৪৭-এ ভারত ভাগের জন্য দায়ী এ রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনেক শিক্ষিত বাংলাদেশীদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তার বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য হিন্দু ভদ্রলোকরা প্রাণপাত লড়াই করেছিল। সেদিন তারা বঙ্গভঙ্গকে মায়ের অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ঐক্যের গান গেয়েছেন। অথচ ১৯৪৭-এ এসে পুরো চিত্রটি পাল্টে যায়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বাংলা শাখার সমর্থনে বিপুলসংখ্যক হিন্দু বাংলাকে ভাগ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তারা চাইল হিন্দু অধ্যুষিত বাংলার অংশটি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হোক। কংগ্রেস হাইকমান্ড এই দাবির প্রতি সমর্থন জানালেও বাংলার রাজনীতির অভ্যন্তরীণ গতিধারার মধ্যেই বাংলা ভাগের উৎস খুঁজে দেখতে হবে। হিন্দু ভদ্রলোকরা প্রথমে হিন্দু পরিচয় নির্মাণ করে এবং রাজনীতিতে এর পরিস্ফুটন ঘটায়। আমরা দেখেছি কিভাবে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বের অজুহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। অতীতে ব্রাত্যজনেরা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা বঞ্চিত ও নিগৃহীত হলেও শুধু রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশে এদেরকে হিন্দু রাজনৈতিক দলের সদস্যভুক্ত করার জন্য চল্লিশের দশকে প্রচেষ্টা চালানো হয়। হিন্দু ব্রাত্যজনদের মধ্যে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উত্তরণের যে আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিল, তাকে ব্যবহার করে এদেরকে ভদ্রলোক রাজনীতির চৌহদ্দিভুক্ত করার প্রয়াস নেয়া হয়। জনপ্রিয় হিন্দু ধর্মীয় উৎসব হয়ে দাঁড়ায় এই রাজনীতির বাহন এবং বাংলার ছোট ছোট মফস্বল শহরে এরা উত্তরোত্তর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে শুরু করে। বাংলায় কংগ্রেসের রাজনীতি হিন্দু চারিত্র গ্রহণ করতে শুরু করলে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের রাজনীতি একাকার হয়ে যায়। ১৯৪৫-৪৬'র নির্বাচনের ফলাফলে বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য রচনার রাজনৈতিক প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটে। ১৯৩৬-৩৭'র নির্বাচনে হিন্দু ভোট কংগ্রেস ও দল নিরপেক্ষদের মধ্যে ভাগ হলেও ১৯৪৫-৪৬'র নির্বাচনে হিন্দু ভোট সুনিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের পক্ষেই গিয়েছিল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ৭১টি সাধারণ আসন এবং ১৫টি বিশেষ হিন্দু আসনে জয়লাভ করে। হিন্দু মহাসভা ২৬টি সাধারণ আসনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মাত্র ২.৭ শতাংশ লাভ করতে সক্ষম হয়। হিন্দু মহাসভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাত্র একজন নির্বাচিত হয়। তিনি হলেন ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। নির্বাচনের এই ফলাফল কোনোক্রমেই হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয় প্রমাণ করে না। বরং এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর এই আস্থারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে যে মহাসভার চেয়ে কংগ্রেসই হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভূমিধস বিজয় হয়। ২৫০ সদস্যের আইন সভায় ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৪টি আসন ছিনিয়ে নেয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের দল ও আত্মীয়রা মিলে মাত্র পাঁচটি আসন লাভ করে। বিশেষ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত চার জন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ

www.pathagar.com

করেন। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠনে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাসাম্য বজায় রাখার দীর্ঘদিনের পুরনো নীতিটি পরিত্যাগ করেন। ১৩ জন মন্ত্রী নিয়োগের প্রচলিত রীতি বদলে দিয়ে তিনি ১১ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। এই মন্ত্রিসভায় মাত্র তিনজন হিন্দু মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত হয়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো এই তিন মন্ত্রীর মধ্যে দুজন ছিলেন তফসিলি সম্প্রদায়ের। মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী এই দিবসটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করায় এবং এই দিবস পালন করতে গিয়ে যে গৃহযুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে হিন্দুরা বলতে চাইল মুসলিম প্রাধান্যের এই সরকার বাংলার পাকিস্তানিকরণ ঘটাচ্ছে। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এক সময় বাংলার অবিভাজ্যতায় বিশ্বাস করতেন। ১৯৪৬-এ তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে লেখা একটি ব্যক্তিগত নোটে তিনি বর্ণনা করেন ভবিষ্যতে মুসলিম লীগ শাসনে বাংলার অবস্থা কী দাঁড়াবে। তিনি লিখলেন, "If Bengal is converted into Pakistan... Bengal Hindus are placed under a permanent tutelage of Muslims. Judging from the manner in which attacks on Hindu religion and society have been made [this] means an end of Bengali Hindu culture. In order to placate a set of converts from low caste Hindus to Islam, very ancient Hindu culture will be sacrificed". প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কয়েক দিন আগে সোহ্‌রাওয়ার্দী এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার যদি একচ্ছত্রভাবে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে পরিণত হয়, তাহলে তিনি বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। হিন্দু সংবাদপত্র সোহরাওয়ার্দীর এই ঘোষণা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানিকরণের ঘোষণা হিসেবে দেখল। হিন্দু বাঙালিরা মনে করল এর মানে হলো তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হারানো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাসত্ববরণ। কোলকাতার হিন্দুদের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সর্বভারতীয় পর্যায়ে নিছক ক্ষমতা ভাগাভাগির কৌশল ছিল না, এটা ছিল তাদের ওপর খড়্গ নামিয়ে দেয়ার এক বার্তা। এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোলকাতায় মহাহত্যাযজ্ঞের (Great Calcutta Killing) ঘটনা ঘটে। এই দাঙ্গায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়। এটি নিছক একটি নামপরিচয়হীন উচ্ছৃঙ্খল জনতার অবোধগম্য বিস্ফোরণ ছিল না। কোলকাতা হত্যাযজ্ঞে সোহরাওয়ার্দীর ইন্ধন দানের বিষয়টি বহুল আলোচিত হলেও হিন্দু নেতাদের গভীর যোগসাজশের বিষয়টি খুব কমই আলোচিত হয়। দাঙ্গায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি মুসলমান নিহত হয়। বল্লভ ভাই প্যাটেল চরম ধৃষ্টতার সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'Hindus had the best of it'. বাস্তবতা হল '৪৬-এর মতো এমন একটি ঘটনার জন্য হিন্দুদের ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। ত্রিশের দশকের শেষদিক ও চল্লিশের দশকের প্রথম দিক থেকে কোলকাতা ও মফস্বল শহরগুলোতে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হচ্ছিল। তারা শারীরিক কসরত ও ছোটখাটো ধরণের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ভদ্রলোক যুবকদের সংগঠিত করছিল। হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক শাখা ভারত সেবাশ্রম সংঘ ছিল এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। চল্লিশের দশকের শুরুতে কোলকাতায় অনেকগুলো স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছিল। কোলকাতায় হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন হিন্দু শক্তি সংঘ ছিল সর্ববৃহৎ এবং সুসংগঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। এই সংস্থার

www.pathagar.com

৫০০ সদস্য বিভিন্ন শাখায় শহরজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। এ ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় ছিল অনেক ছোট দল। হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতাবাদী আদর্শ ও রাজনীতির ভিত্তিতে কোলকাতা ও অন্যান্য মফস্বল শহরে হিন্দু ভদ্রলোক যুবকদের সংগঠিত করতে এই সংগঠনগুলো খুবই কার্যকর ও তৎপর ছিল। এরা যেসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত তার মধ্যে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংগঠনের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়। ডা. মানবেন্দ্রনাথ সরকার নামে এক ব্যক্তি মুসলমানদের সমাবেশের ওপর বোমা নিক্ষেপের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এখন তিনি একজন কংগ্রেসি। আগে ছিলেন হিন্দু মহাসভার সদস্য। তিনি বলেছেন, হিন্দু মহাসভার আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বাংলা ভাগকে সমর্থন করে। হিন্দুদের পক্ষে আরো ছিল আইএন-এর জেল ছাড়া পাওয়া সৈনিকরা ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা। কোলকাতা হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করতে ছাত্র, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, প্রাক্তন সৈনিক, দোকানদার, পাড়ার মাস্তান, কংগ্রেসি ও মহাসভাওয়ালারা একজোট হয়ে কোলকাতার রাস্তায় '৪৬-এর হত্যাযজ্ঞে হিন্দুদের বিজয় নিশ্চিত করেছিল। এটাই ছিল বাংলা ভাগের জন্য হিন্দু আন্দোলনের ভিত্তি।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কাহিনী বারবার নানাভাবে প্রচারিত হতে থাকল। হৃদয়বিদারক ভাষায় প্রচার করা হতে থাকল কিভাবে শান্তিপ্রিয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর মুসলিম নির্যাতন চলেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি নামে একজন সুপরিচিত হিন্দু কবির কবিতা '১৬ আগস্ট উনিশ শ ছেচল্লিশ' কোমলমতি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো সরস্বতী পূজার সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য। এ ছাড়াও ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেককারী বহু প্রচারপত্রও বিতরণ করা হয়।

সমগ্র বাংলায় বাংলা ভাগের পক্ষে সভা ও গণদরখাস্ত পেশের আয়োজন করা হয়। হিন্দু প্রধান জেলাগুলোতে বাংলা ভাগ আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ জেলাগুলো থেকেও গণদরখাস্ত পেশের ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ তোলা হয় মুসলিম লীগ সরকার বাঙালি হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেছে। এই সরকার তাদের জানমাল রক্ষা করছে না।

মনে করা হয় ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বাংলা ভাগ আন্দোলনের মূল হোতা ছিলেন। সন্দেহ নেই শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বাংলা ভাগের অন্যতম ওকালতকারী ছিলেন। বাস্তবে বাংলায় কংগ্রেসই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বামপন্থী ও বসুভাতৃদ্বয়ের সঙ্গে আত্মঘাতী লড়াইয়ের পর দলটি পুনর্গঠিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং হিন্দু স্বার্থের সাচ্চা প্রতিভূতে পরিণত হয়। এই সময় ডা. বিধান রায় ও নলিনী রঞ্জন সরকার বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসন দখল করে নেন। এই নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বাংলাকে ভাগ করেই তারা তাদের পার্টির মধ্যকার ক্ষমতাকে পার্টির বাইরে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে পারেন। এর জন্য তারা হিন্দু মহাসভার সঙ্গেও একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

১৯৪৭-এর এপ্রিলে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাবি পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক দিনের হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি ছিল বাংলা ভাগ আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। একই বছর মে মাসে ইতিহাসবিদ ড. যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে কোলকাতায় কংগ্রেস ও মহাসভা যৌথভাবে বাংলা ভাগের দাবিতে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। স্থানীয় পর্যায়ে কংগ্রেস ও মহাসভার মধ্যে এ ধরনের সহযোগিতা গড়ে ওঠে। স্থানীয় মহাসভা কমিটিগুলো বাংলাভাগের পক্ষে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করে সেগুলো ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির কাছে না পাঠিয়ে সরাসরি কংগ্রেসের নেতাদের কাছে পাঠানো হতো। স্পষ্ট হয়ে গেল, হিন্দু মহাসভা নয়, কংগ্রেসই হলো এই আন্দোলনের মূল নেতা। জুলাই ১৯৪৭ স্পষ্ট হয়ে গেল বাংলা ভাগ হবেই।

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে আন্দোলনের যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য বাংলার খাদি গ্রুপ নেতারা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসি হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দু-মহাসভার মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যারা শ্যামা প্রসাদকে এ জন্য উৎসাহিত করেন। শ্যামা প্রসাদ ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিসভায় যোগদানে রাজি ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ইচ্ছানুযায়ী কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজি ছিলেন না।

কংগ্রেস বাংলা ভাগের আন্দোলনে প্রধান শরিকে পরিণত হলো। বস্তুত কংগ্রেস ছিল নেতৃত্বের ভূমিকায়। কংগ্রেস মহাসভা থেকে পৃথকভাবে বাংলা ভাগের পক্ষে জনসভা করতে শুরু করল। বাংলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির বলে বাংলা ভাগের আন্দোলন গতি পায়।

এই আন্দোলনে প্রধান সামাজিক শক্তি ছিল হিন্দু ভদ্রলোকরা। ভদ্রলোক রাজনীতির স্রোতপ্রবাহ যৌক্তিক পরিণতি হিসেবে বাংলা ভাগের দিকে অগ্রসর হলো। প্রাদেশিক রাজনীতিতে ক্ষমতা হারানোর হতাশা, এবং জমিদারি প্রথা দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগোলে ভদ্রলোক গোষ্ঠীগুলো তাদের ঐতিহ্যগত সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণে মনোনিবেশ করল। বাংলা ভাগ হলে বিভক্ত বাংলার হিন্দু প্রধান অংশটির ওপর তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হবে মনে করেই তারা বাংলা ভাগের পথে এগুলো। বাংলার এই অংশটিতেই মুসলিম ক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। বাংলার এই অঞ্চলেই বাংলা ভাগের পক্ষে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। যে ভদ্রলোক গোষ্ঠী একদিন অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিল, তারাই এখন বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা ছাড়াও আরো অনেক ক'টি সংগঠন ছিল যেগুলো একটি পৃথক হিন্দু প্রদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। পৌর কমিশনারদের সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ, জমিদারদের সমিতি, বার সমিতিসমূহ, বাণিজ্য সমিতিসমূহ, কর প্রদানকারী সমিতি, স্থানীয় ক্লাবসমূহ, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনসমূহ প্রভৃতির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্রোতের মতো গণদরখাস্ত পাঠানো শুরু হলো। এসব সংস্থার মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেসব ক্ষেত্রে গণদরখাস্তের মধ্যে সাবধানতার সূচক হিসেবে উল্লেখ করা হতো যে, শুধু হিন্দু সদস্যরাই দরখাস্তের বিষয়বস্তু অনুমোদন করেছে। এই হিন্দু সদস্যরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল ভদ্রলোক গোষ্ঠীভুক্ত।

www.pathagar.com

বাংলা ভাগ আন্দোলনের পেছনে অর্থনৈতিক স্বার্থের হিসাব-নিকাশ প্রবলভাবে কাজ করেছে। আন্দোলনটি একদিকে যেমন ছিল একটি শক্তিশালী ঐকতান, অন্যদিকে আন্দোলনের রসদ হিসেবে অর্থের যোগানও ছিল অঢেল। ব্যবসায়ীরা আন্দোলনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিল। এই ব্যবসায়ীরা কেবল বাংলার ব্যবসায়ী ছিল না, এদের মধ্যে অনেকেই ছিল উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ থেকে আগত। বিড়লা, ঈশ্বর দাস জালান, গোয়েংকা এবং নলিনী রঞ্জন সরকারের মতো লাখপতি ও ক্রোড়পতিরা আন্দোলনের সর্বোচ্চ প্রচার কমিটির সদস্য হিসেবে সভায় বসে কৌশল নির্ধারণ করতেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আর্জি পেশ করে জানিয়েছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার শাসনে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য পঙ্গু হয়ে গেছে। তারা সর্বান্তকরণে বাংলা ভাগকে সমর্থন করে বলেছিল, এর মাধ্যমেই বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলা ভাগের সমর্থনে আয়োজিত অনেক ক'টা জনসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। বস্তুত জি ডি বিড়লা অনেক বছর ধরেই বাংলা ভাগের পক্ষে ওকালতি করে আসছিলেন। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে বিড়লা মহাদেব দেশাইকে বলেছিলেন, 'আমি বিচ্ছিন্নতার পক্ষে এবং আমি মনে করি না এটা অবাস্তব অথবা হিন্দু স্বার্থবিরোধী। কোলকাতার ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলা ভাগ ছিল অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। ১৯৩০-এর মহামন্দার ফলে পাটের ব্যবসা মারাত্মকভাবে মার খায়। মাড়োয়ারিরা পাটের ফটকা কারবার করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিল। পাটের ব্যবসায় মন্দা দেখে তারা এই ব্যবসা ত্যাগ করে অন্য ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আনন্দিলাল পোদ্দার, ঝুনঝুনওয়ালা, শেঠিয়া এবং করনারিদের মত মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা মহামন্দা-পরবর্তী সময়ে কয়লার খনিতে প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করেছিল। বিড়লা ভ্রাতারাসহ অন্যান্য মাড়োয়ারি চিনি, কাগজ, বস্ত্র, রসায়ন, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স খাতে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। এসব শিল্পকারখানা তারা বাংলার বাইরে গড়ে তুলেছিল। এর ফলে কোলকাতার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হয়। কোলকাতার ব্যবসায়ীদের জন্য মহামন্দা-পূর্ববর্তী সময়ে পাট উৎপাদনকারী পূর্ববঙ্গের যে গুরুত্ব ছিল, চল্লিশ দশকে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের জন্য সেই গুরুত্ব আর থাকল না। পূর্ববঙ্গের বাজারের প্রতি আকর্ষণও তারা হারিয়ে বসেছিল। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ফলে এই অঞ্চলের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শূন্যের কোটায় গিয়ে ঠেকেছিল। ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহারের পর তাদের নজর ছিল ভারতব্যাপী বাজারের ওপর। কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হচ্ছিল তা থেকে ফায়দা উঠানোর জন্য প্রয়োজন ছিল বাংলাকে ভাগ করা। মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিল মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বাংলার মুসলিম লীগ হাসান ইস্পাহানির আর্থিক সহায়তার ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল। স্বাধীনতার পর এই দলটি মুসলিম উদ্যোক্তাদের প্রতি যে আনুকূল্য দেখাবে, সে ব্যাপারেও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের কোনো সন্দেহ ছিল না। তাদের জন্য কংগ্রেস সরকার হবে অত্যন্ত সহায়ক। বস্তুত কংগ্রেস সরকার মাড়োয়ারিদের পকেটস্থ হয়ে যাবে। বাংলা ভাগই হলো একমাত্র উপায় যার ফলে একটি কংগ্রেস সরকার

www.pathagar.com

বাংলার ক্ষমতায় বসতে পারবে। হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলো নিয়ে বাংলাকে যদি ভাগ করা যায় তাহলে সেই বাংলায় থাকবে কোলকাতা। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? বিড়লা ও তার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলা ভাগ ছিল একটি উত্তম সমাধান।

জমিদার, পেশাজীবী, বাংলার কেরানিকূল ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি বাংলা ভাগের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের কম সুবিধাভোগী অংশগুলোও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। বর্ধমান ও হুগলি জেলার চারটি গ্রামীণ এলাকা থেকে প্রেরিত গণদরখাস্তকারীদের পেশাগত বিন্যাস থেকে দেখা গেছে এদের একটা বড় অংশ চাষবাসকে নিজেদের পেশা হিসেবে দেখিয়েছে। পূর্ববঙ্গের কিছু মহকুমা ও থানা যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তাদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হলো যে, যে করেই হোক তাদের থানা ও মহকুমাকে যেন হিন্দুরাষ্ট্রভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এই এলাকাগুলো হবে পূর্ববঙ্গে ভারতের বড় ধরনের ছিটমহল। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা নিয়ে 'বঙ্গভূমি' নামে হিন্দুদের জন্য একটি সংরক্ষিত রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ-বিরোধী একটি গোষ্ঠী ভারতের আশ্রয়ে থেকে যে দাবি তুলেছে তাকে '৪৭-এর পূর্ববঙ্গভুক্ত বাংলা ভাগকারীদের দাবির প্রতিধ্বনিস্বরূপ মনে হয়। উল্লেখ্য যে, বরিশালের গৌরনদী, উজিরপুর, থালাকাঠি, স্বরূপকাঠি, বাবুগঞ্জ, নলছিটি, বাকেরগঞ্জ, কাউখালি ও পিরোজপুর থানা থেকে ১৭ মে ১৯৪৭ এইসব এলাকাগুলোকে হিন্দু রাষ্ট্রভুক্ত করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল। বরিশালে হিন্দু মহাসভার সাংগঠনিক ভিত বেশ মজবুত ছিল। অবাক ব্যাপার হলো মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ থেকে যারা বাংলা ভাগের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তারা কখনো এই সত্যের মুখোমুখি হতে চায়নি যে, তাদের এলাকাগুলো অচিরেই পাকিস্তানভুক্ত হবে। '৪৭-এর মাঝামাঝি সময়ে যখন দেখা গেল তাদের উদ্ধারের জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই তখন তারা নিরুপায় হয়ে নিজ জন্মভূমি, বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিজমা ফেলে কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গগামী উদ্বাস্তুদের মিছিলে যোগ দিল। স্মরণকালের ইতিহাসে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ বাস্তুত্যাগের নজির।

যুক্ত বাংলার পরিকল্পনা

বাংলা ভাগের পক্ষে হিন্দু জনমতকে প্রভাবিত করতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে সবাই গা ভাসিয়ে দেয়নি। কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে মুষ্টিমেয়সংখ্যক হিন্দু রাজনীতিবিদ এই জোয়ার ঠেকাতে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালান। '৪৬-এর জানুয়ারিতে বসু কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক ৬ ডিসেম্বর পরিকল্পনা গ্রহণের ইস্যুতে কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ৬ জানুয়ারি '৪৭ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিবৃতি দিল যে, কংগ্রেস জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বাধ্যবাধকতা কিংবা চাপিয়ে দেয়ার মতো সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। অর্থাৎ কংগ্রেস স্পষ্টতই বাংলা ভাগের পক্ষে দাঁড়াল। মার্চ ১৯৪৭ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি পাঞ্জাব প্রদেশকে মুসলিম ও অমুসলিম এলাকার ভিত্তিতে ভাগ করার পক্ষে দাঁড়াল। অমৃত বাজার পত্রিকায় ১৫ মার্চ ১৯৪৭ শরৎ চন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বললেন যে তাঁর মতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার সাবধানবাণী ও প্রতিবাদ উচ্চারণ করা

www.pathagar.com

প্রয়োজন। কেননা তিনি মনে করেন যে প্রদেশগুলোকে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ করা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান নয়। বাংলার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট ছিল না। তবে তার অন্তর্নিহিত বার্তা ছিল বাংলা ভাগের পক্ষে। কিন্তু কংগ্রেসের পাঞ্জাবসংক্রান্ত প্রস্তাবটি ছিল প্রদেশটিকে ভাগ করার পক্ষে সরাসরি অবস্থান। এ কারণেই শরৎ বসু অমৃত বাজার পত্রিকায় নিজ অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। অচিরেই স্পষ্ট হয়ে গেল বসুর মতের পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কোনো সমর্থন নেই। এক পক্ষ কালের মধ্যে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এক প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলা ভাগের প্রতি খোলামেলাভাবে সমর্থন ব্যক্ত করল। তার কিছু দিন পর গণপরিষদের ১১ জন হিন্দু সদস্য গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের দবি জানাল। এসব সত্ত্বেও শরৎ বসু কিরণ শংকর রায়ের সমর্থন নিয়ে শেষ মুহূর্তে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বভৌম যুক্ত বাংলা গঠনের প্রশ্নে সমঝোতায় পৌঁছাতে প্রচেষ্টা চালান। মে ১৯৪৭ শরৎ বসু তাঁর প্রস্তাবের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করলেন। তাঁর প্রস্তাবিত রূপরেখার প্রতি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শক্তিধর সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। এই রূপরেখার মূল ভিত্তি ছিল যুক্ত নির্বাচন, বয়স্ক ভোটাধিকার এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদের আসন বণ্টন। স্বাধীন বাংলা সরকারের মন্ত্রিসভায় হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা হবে সমানসংখ্যক। প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমানরা সমান সংখ্যায় সরকারি চাকরি লাভ করবে। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র হবে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কেননা সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যেই নিহিত আছে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান।

যুক্ত বাংলার পরিকল্পনাটি ছিল অনেকটা দিবাস্বপ্নের মতো। গান্ধী এই পরিকল্পনার প্রতি শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন দিয়েছিলেন। গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছেন কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি তাঁকে শরৎ বসুর পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করায় ভর্ৎসনা করে। সুতরাং তিনি এর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারে বাধ্য হন। কংগ্রেস হাইকমান্ড এরই মধ্যে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করে যে, ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্র থাকতে হবে। এবং ভারত হবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোকে ভারত থেকে ছেঁটে ফেলতে পারলেই ভারতের ঐক্য ও সংহতি মজবুত হবে। জওহরলাল নেহরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রায়ই বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পরের মুখোমুখি হতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন একমত। নেহরু ভারতের বলকানিকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনো অস্পষ্টতা ছিল না যে প্রদেশগুলোকে কোনোক্রমেই ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। প্যাটেল মনে করতেন কংগ্রেস যতটুকু ভূ-খণ্ড ছেড়ে দিতে রাজি তার চেয়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূ-খণ্ডও জিন্নাহকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তাঁর এই কঠোর মনোভাবের কারণেই তিনি বাঙালি হিন্দুদের বাংলা ভাগের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। বাঙালি হিন্দুদেরকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন, "Bengal cannot be isolated from the Indian Union. Talk of a Soverign Republic of Independent Bengal is a trap to induce the

www.pathagar.com

unwary and the unwise to enter the parlour of the Muslim League. The Congress working committee is fully aware of the situation in Bengal, and you need not be afraid at all. Bengal has got to be partitioned, if the non-Muslim population is to survive". মোদ্দা কথা হলো, প্যাটেলের দৃষ্টিতে সার্বভৌম যুক্তবাংলার ধ্বনি ছিল মুসলিম লীগের ফাঁদে আটক করার কৌশল। নগণ্যসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী বাংলা ভাগ রোধ করার জন্য বৃথাই কংগ্রেসের প্রতি আবেদন করলেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে অনুপ্রাণিত বাংলা ভাগের সম্ভাবনায় আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর মন ভেঙে গিয়েছিল। তিনিও কংগ্রেস হাইকমান্ড থেকে কোনো রকম সহানুভূতি পেলেন না। জে বি কৃপালানি আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে লিখলেন, "All that the Congress seeks to do today is to rescue as many as possible form the threatened domination of the League and Pakistan. It wants to save as much territory for a free Indian Union as possible under the circumstances. It therefore insist upon the division of Bengal and Punjab... I do not see what else the Congress can do under the circumstances". সার্বভৌম বাংলা পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেস হাইকমান্ডের অনমনীয় বিরোধিতার ফলে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, তাঁর বাহ্যিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, কংগ্রেসের কাছ থেকেই তাঁকে ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হয়েছিল। অবশ্য যুক্ত বাংলার পরিকল্পনাটির এর আগেই মৃত্যুবরণ করে। কারণ, বাংলায় এই পরিকল্পনা সার্বজনীন সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। আবুল হাশিম ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রশ্নে মুসলিম লীগ গভীরভাবে বিভক্ত ছিল। সকল মুসলিম উপদল চাইছিল বাংলা অবিভক্ত থাকুক, কিন্তু তারা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার প্রশ্নে একমত হতে পারেনি। মওলানা আকরাম খাঁ এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের মতো জিন্নাহর অনুগতরা চাইতেন বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হউক। নিদেনপক্ষে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক রাখবে। মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা পাকিস্তান ভাবধারার প্রতি এতই আন্তরিক ছিল যে, তারা পাকিস্তানের বিনিময়ে সমাজতান্ত্রিক বাংলা প্রজাতন্ত্রের কথা ভাবতেই পারত না। আবুল হাশিম দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে এমন একটি সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করলে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের পক্ষ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হলো বাংলা ভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে তাদেরকে সঠিক পথে রাখার জন্য গুলি ভর্তি পিস্তল প্রস্তুত রাখা আছে। জিন্নাহ নিজে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। শরৎ বসু বিশ্বাস করতেন, জিন্নাহ তাঁকে সমর্থন করবেন এবং সমর্থনের জন্য তিনি জিন্নাহর প্রতি আবেদনও জানিয়েছিলেন। জিন্নাহ স্বাধীন যুক্ত বাংলার বিরোধিতাও করেননি আবার সমর্থনও করেননি। জিন্নাহ্ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরাও সেই স্বপ্ন দেখতেন। কাজেই জিন্নাহ্‌র দোহাই দিয়ে তারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

www.pathagar.com

যুক্ত বাংলা পরিকল্পনার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা ছিল বাঙালি হিন্দুদের কোনো বাস্তব সমর্থন না থাকা। শরৎ বসু তাদেরকে বোঝাতে পারেননি যে, সার্বভৌমত্বের ওপর বিরোধপূর্ণ অংশীদার হওয়া বিভক্তি ও বিরোধমুক্ত ক্ষমতা ভোগ করার চেয়ে শ্রেয়। মুষ্টিমেয়সংখ্যক কংগ্রেস নেতা তাঁকে সমর্থন করেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন কিরণ শংকর রায়, অখিল চন্দ্র দত্ত, নিশিথ নাথ কুন্ডু ও আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। তাঁরাই শরৎ বসুর প্রয়াসের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মার্চ ১৯৪৭ কংগ্রেস ঘোষণা করল যে, বাংলাকে ভাগ করতে হবে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করায় এটি বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে তীব্র অবিশ্বাসের উদ্রেক করে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রের জন্য তাদের আকুতির কথা ব্যক্ত করে। তারা মনে করেছিল সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো একজন অনির্ভরযোগ্য মুসলিম প্রধানমন্ত্রীর অধীনে যাওয়ার চেয়ে পৃথক হওয়াই শ্রেয়। আর এভাবেই শরৎ বসু তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।

শেষের কথা

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ তে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ১৯৪৭-এ আবারো বঙ্গভঙ্গ বা বাংলা ভাগ বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুদের আত্মপরিচয় নির্মাণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। আজ থেকে এক শতাব্দী আগে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের এই অঞ্চলের প্রশাসনিক মানচিত্র পরিবর্তন করে যে প্রক্রিয়ার সূচনা করে সেই প্রক্রিয়াই পরবর্তী ৬৫ বছরে রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলার মুসলমানরা এর তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। যখন তারা বুঝতে পেরেছিল বঙ্গভঙ্গ তাদেরকে নিজের ভাগ্য গড়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে ততদিনে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের কায়েমি স্বার্থপুষ্ট আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে বঙ্গভঙ্গ রদ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে আশাহত পূর্ববঙ্গবাসীদের জন্য সান্ত্বনা হিসেবে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ শাসকরা দেয় সেটিও হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরোধিতার মুখে ১০ বছর বিলম্বিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে প্রগতি, আধুনিকতা ও উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণে যত রকম প্রয়াস আমরা লক্ষ করি তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। এ কালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকেই হয়তো জানেন না ১৯২১ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না হলে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম না। বঙ্গভঙ্গ না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও হতো না।

বঙ্গভঙ্গের পর থেকে আমাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোর একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কোলকাতা-কেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকদের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজার পূর্ববাংলার অভ্যুদয়ের রক্তক্ষরণ। জাত্যাভিমান ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের দাবির সঙ্গে যখন শ্রেণী স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে তখন সেই

www.pathagar.com

স্বার্থের বর্ম হয়ে ওঠে দুর্ভেদ্য। শ্রেণী সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের অন্য শ্রেণীতে উত্তরণের সুযোগ থাকে। কিন্তু বর্ণ সমাজ কোনরকম উত্তরণের সুযোগ দেয় না। উচ্চবর্ণ এবং উচ্চ শ্রেণীর অবিভাজ্যতা মানবিকতাকে সংকীর্ণ স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়। শ্রেণী ও বর্ণের অবিভাজ্যতা ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে, ঋদ্ধ সামাজিক আচরণকে করে তোলে অসম্ভব। বঙ্গভঙ্গ উত্তর বাংলার রাজনীতিতে যে সাম্প্রদায়িক অসূয়া ও হলাহলের বিস্তার ঘটে তার মূলে ছিল ঔপনিবেশিক আনুকূল্য প্রাপ্ত শ্রেণী আধিপত্য ও সনাতন ধর্মের বিকৃতিজাত বর্ণগত মর্যাদার রসায়ন। যে সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা একাকার হয়ে যায়, সে সমাজ হয় যৌক্তিকতা বর্জিত। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হবে বলে, তারাই আবার মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মতো নিষ্ঠুরতায় লিপ্ত হলো বাংলাকে ভাগ করে।

বঙ্গভঙ্গ ও তার পরবর্তীকালের ইতিহাস ভালো করে না জানলে আমরা কখনোই জানব না কী আমাদের পরিচয়, জানব না আমরা কোথা থেকে এসেছি, জানব না বাংলাদেশের উৎস কোথায়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বঙ্গভঙ্গ ও তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনীতির যে কোনে প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয় একই মাটি ও মায়ের সন্তান দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের ইতিহাসের নায়কের আসনে স্থান দিয়ে। ভদ্রলোক হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা জাগিয়ে তুলেছিল মুসলমানের সম্প্রদায়বোধ। এই দুই ধরণের মানসিকতার মধ্যে কোনটি অধিকতর অবাঞ্ছিত সেই বিতর্ক নিরর্থক। তফাৎ শুধু এটুকুই– প্রথমোক্তটি স্বার্থ সংরক্ষণের বর্ম আর পরোক্তটি বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া মাত্র।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

1. Ahmed Sufia — Origins of the Dhaka University. 'The Dhaka University Studies'. Vol. xxxx. March. 1984, Dhaka.
2. Bandyopadhyay, Sekhar — From Plassey to Partition. Orient Longman. New Delhi, 2004.
3. Bose, Sugata — Agrarian Bengal, Orient Longman. New Delhi, 1987.
4. Chandra, Bipan — India's Struggle for Independence, Penguin Books, New Delhi, 2000.
5. Chatterji, Joya — Bengal divided–Hindu communalism and Partition 1932-1947, Cambridge University Press (First Indian Edition), New Delhi, 1995.
6. Chaudhuri, Nirad C. — The Autobiography of an Unknown Indian. University of California Press, Berkely and Los Angeles 1968.
7. Goradia, Nayana — Lord Curzon- The Last of the British Moghuls, OUP, New Delhi, 1993.
8. Hasan, Mushirul (ed) — Partition: Process, Strategy and Mobilization, OUP, New Delhi, 1994.
9. Heehs, Peter — Nationalism, Terrorism, Communalism, Essays in Modern Indian History. OUP. New Delhi, 1998.
10. Hunter, W.W — The Indian Musalmans, Khoshroz Publications Ltd., Dhaka, 1999.
11. Kazimi, M.R. — M.A. Jinnah-Views & Reviews. OUP. Karachi, 2005.
12. Mehra, Parshotam — A Dictionary of Modern Indian History-1707-1947, OUP, 1985.
13. Pirzada, Sharifuddin, Syed — Foundations of Pakistan-All India Muslim League Documents: 1906-1947. Vol.I, 1906-1924. National Printing House Limited, Karachi, 1969.
14. Sen, Amiya P. — Hindu Revivalism in Bengal 1872-1905, OUP, New Delhi, 1993.
15. Sengupta, Nitish — History of the Bengali-Speaking People. UBSPD, New Delhi, 2001.
16. Rahim, Aminur — Politics and National Formation in Bangladesh, UPL. Dhaka, 1997.
17. Talukdar, HR, Mohammad — Memoirs of Huseyn Shahid Suhrawardy, UPL, Dhaka, 1987.
18. আহ্‌মদ, মুজফ্‌ফর — সমকালের কথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৩।
19. চৌধুরী, ইসলাম, সিরাজুল — জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, 'নতুন দিগন্ত', সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ণ কেন্দ্র, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, ২০০৬।
20. জাফর, আবু — রাজভবন থেকে বঙ্গভবন, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০৬।
21. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত) — নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮।
22. রায়, সত্যেন্দ্র নাথ — রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ- সমাজ চিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৫।
    ঐ — রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ- স্বদেশচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৮।
23. হাবীবুল্লাহ, মুহম্মদ — পাকিস্তানঃ স্বপ্ন ও চূড়ান্ত পরিণতি, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০৬।

www.pathagar.com

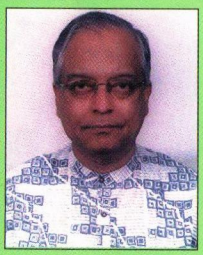

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌। জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের তিতাহাজরা গ্রামে। বৈচিত্রময় বর্ণাঢ্য জীবনের মানুষ। কর্মজীবন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অধ্যাপনা ও গবেষণা পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৬৭'র ডিসেম্বরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের বিপ্লবী নেতা। ১৯৭০'র ২২ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র কর্মসূচি উত্থাপনের অপরাধে ইয়াহিয়ার সামরিক আদালতে কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে দীর্ঘ ২২ মাস কারান্তরালে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৭১'র ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান খান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কমরেড আব্দুল হক, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড দেবেন সিকদারের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ১৯৭২ সনে পুর্নগঠিত মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে লেখালেখি করে আসছেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার আর্থ-সামাজিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তি এবং অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গ তার সাম্প্রতিক লেখালেখির মূল উপজীব্য।

১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৬ তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। এ ছাড়া তিনি রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সদস্য, সোনালী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর অধিকারী প্রফেসর মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন।

এ ছাড়া তিনি কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, ডেনমার্কের সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট রিসার্চ, নেপালের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মাউন্টেন ডেভলপমেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইউনাইটেড ন্যাশন্স ইউনিভার্সিটি এবং ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০টি। তাঁর অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ Land Livelihood and Change in Rural Bangladesh ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (UPL) থেকে প্রকাশিত হয়েছে ও গবেষক মহলে সমাদৃত হয়েছে। প্রফেসর মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌ তাঁর গবেষণা কর্মকান্ড উপস্থাপনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, ইরাক, পাকিস্তান, ভারত, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কা সফর করেছেন।